: 47-6522

With best compliments of

DATTA ENGINEERING CORPORATION

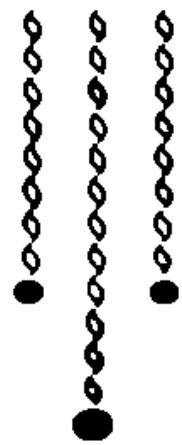

Earthmoving Spare Parts Manufacturers

25, ASUTOSH MUKHERJEE ROAD,
CALCUTTA-20

দিকে দিকে দৃঢ় সংকল্প——

জাতির কর্মযজ্ঞে নূতন প্রভাত

দেশের সর্ব্বাত্মক উন্নতির জন্য উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলির যথার্থ রূপায়ণের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষিত ২০ দফা অর্থনীতি কর্মসূচীর রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করেছেন :

- পশ্চিমবঙ্গ ঋণভার লাঘব ব্যবস্থা
- ৬ কোটি টাকার এক সুসম গ্রাম উন্নয়নের উৎপাদন কর্মসূচী
- ৩ কোটি টাকার এক বিশেষ কর্ম সংস্থানের উদ্যোগ
- ভূমিহীন কৃষকদের চাষের জমি এবং ক্ষেতমজুরদের জন্য বাস্তুজমি দ্রুত বিতরণ
- নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বস্ত্র-বিক্রয়ের ব্যবস্থা
- বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার বাইরে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ

আরও অনেক কর্মসূচী রূপায়িত হতে চলেছে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

With Best Compliments of :

BRIGHTWAYS

27, Park Lane,

Calcutta-16

শীতের দিনের উষ্ণ আরাম

Bata

With Best Compliments of :

D. K. BANERJEE

CONSULTING ENGINEER

91, Golf Club Road,

Calcutta-700033

কৃষ্ণশাস্ত্র

মননশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক

অষ্টম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা | তেরশ' বিরাশি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ | — | গল্প সংখ্যা প্রসঙ্গে
গৌরাঙ্গ ভৌমিক | ১৪৩ | কবিতাবলী
মদন দাশ | ১৪৪ | অহেতুক
শিবাজী গুপ্ত | ১৪৫ | পথচারী জানে না এসব
রবীন সুর | ১৪৬ | শ্রুতি
ফণী বসু | ১৪৭ | ভ্রমর খুশী
রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় | ১৪৮ | দেখে শুনে বসে আছি
রবি গঙ্গোপাধ্যায় | ১৩৯ | ব্যর্থতা
শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় | ১৫০ | ঝাউতলায় সন্ধ্যা
দীপ সাউ | ১৫১ | প্রাত্যহিক
তাপস মিত্র | ১৫২ | নরকেও যেতে পারি
বঙ্কিম চক্রবর্তী | ১৫৩ | চোখ
সমীর সেনগুপ্ত | ১৫৪ | তুমি আমি উলঙ্গ সবাই
বিপ্লব চন্দ | ১৫৫ | আমিও ধূসর হবো
দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায় | ১৫৫ | ভেবেছিলাম তুমি
কল্লোল বিশ্বাস | ১৫৬ | চোদ্দ বিঘের বাড়ীটা
স্বপন চক্রবর্তী | ১৫৯ | জঙ্গমে স্থাবরে বড় একা
তেজেন অধিকারী | ১৬০ | অসময়
প্রফুল্ল মিশ্র | ১৬০ | চিরকুট
আশিষ ঘোষ | ১৬১ | এক বিনিদ্র রাতে
ড: বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় | ১৬২ | 'মুক্তি' ও শরৎ সাহিত্য
জ্যোৎস্নাময় বসু | ১৭১ | বৃত্ত
প্রবীর সাহা | ১৭৮ | বেচারা (অনুবাদ)
সুনীলেন্দু কোনার | ১৮৮ | নিয়ন্ত্রিত যীশু
মীনা ভৌমিক | ১৯৭ | গল্পের কস্তুরী
আনন্দ রায় | ২০৩ | সে এক দুনিয়া
দীনেশচন্দ্র সিংহ | ২০৯ | কবি কাহিনী

গ্রন্থন
শ্রীপ্রভাস

সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র সিংহ

বয়সে তরুণ হলেও এযাবৎ প্রকাশিত
প্রভাস ভদ্রের
গল্প সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য
তাঁর ছ'টি গল্পের সংকলন গ্রন্থ

স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী

●

পাখপাখালি গাছগাছালি নিয়ে সৌন্দর্যময় প্রকৃতির বুকে
হঠাৎ কোন একসময় কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়···
শিল্প···যন্ত্র···কর্ম
এবং বিচিত্রসব মানুষের চরিত্র নিয়ে লেখা
জ্যোৎস্নাময় বসুর
নতুন স্বাদের উপন্যাস

সিকিদিরি

●

শুভ নববর্ষে প্রকাশিত হচ্ছে

লিপিকা ৩০/১-এ কলেজ রো, কলি-৯

Phone Office 33-6837
Fact. Lab. 78

With Compliments from :

ORIENT PAINTS & CHEMICALS

Manufacturers of—

Quality Paints & Resins, Allums, Sodium Sulphide etc.

Head Office :

72, Ratan Sarkar Garden Street,
Calcutta-700007

ছোট পত্রিকা যেন অভিমানী ছোট ছেলে। তার কোন কোন আচরণ হয়তো বেয়াড়া। কিন্তু সে যে বড়-মেজোর সঙ্গে এক পাতে বসতে, এক ক্ষুরে মাথা মুড়াতে নারাজ সে তার ছোটত্ব রক্ষার তাগিদেই এটুকুই তার বৈশিষ্ট্য। এবং এটাকেই অশোভন ঔদ্ধত্য মনে করে দাতাপরিত্রাতার দল তার ওপর খড়্গহস্ত। ছোট একা সাত রঙা রামধনু হয়ে চোখ ধাঁধাঁতে চায় না। ধানের শীষে ভোরের শিশির বিন্দু হয়ে চিক চিক করতে পারলেই তার সন্তুষ্টি। সূর্যের প্রয়োজন নিত্যনৈমিত্তিক; সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্যের স্থান সেখানে গৌণ। চন্দ্রের সৌন্দর্য পক্ষাধীন; তার হ্রাসবৃদ্ধি অপরের কৃপাকটাক্ষের দান। কিন্তু ক্ষুদ্র তারকারাজি কোন পক্ষাপক্ষের তোয়াক্কা করে না। সর্বশক্তিমান সূর্যের খরপ্রতাপে তারা দিবালোকে ম্লান হতে পারে; কিন্তু চাঁদের মতো অপরের বদান্যতায় কলায় কলায় ষোল কলায় পূর্ণ হতে অসম্মত এবং দয়াদাক্ষিণ্যে ভাটা পড়লেই নিষ্কলায় পরিণতি তাদের কাম্য নয়। তাই আকাশে চাঁদ উঠুক আর নাই উঠুক তারা অমানিশা বা পৌর্ণমাসীতে সমভাবেই অনির্বান। তারা-হীন আকাশে যেমন চাঁদকে উলঙ্গ মনে হবে তেমনি চন্দ্রহীন আকাশের তারাপাতও পুনরায় পৌর্ণমাসীর দ্যোতক। তাদের টিম্‌টিম্ মিটমিট দপদপ আলো, অন্ধকার দূরীকরণে সমর্থ না হোক, সেগুলি আবৃত আলোকের প্রতীকরূপেই প্রতিভাত।

অথচ একটু 'আস্তে হেঁ হেঁ করলে', 'দাদা দাদা' বলে অনুগৃহীতের হাত কচলালে কিন্তু ছোটরা বড় ও মেজোর অনুপাতে প্রাপ্যেরও অধিক পেতে পারে। কিন্তু ঐ যে বললাম—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়—সময় থাকতে গুছিয়ে নেওয়ার মর্জিই নেই বেটাদের, হয়তো মুরদও নেই। তাই মিসেস্ ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো খালি পেটেই ধেই ধেই নেচে বেড়ায়। ততক্ষণে বড় ও মেজো মিলে কম্পিটিশনে বাঁট চুষে একেবারে আমসি। এখন দুগ্ধহীন তৃতীয় সন্তানের বেঁচে থাকাই দায়—কারণ চলতি কথায় বলে 'মাগ্‌না দুধে পোলা বাঁচে না।' আর যম-দেবতার কৃপায় কিছুদিন মরণ-বাঁচন লড়াই চালিয়ে গেলেও হৃষ্টপুষ্টি তার ঠিকুজিকুলুজিতে নেই। সমস্যাতেই তার সৃষ্টি সমস্যাতেই তার স্থিতি আর সমস্যাতেই তার লয়। তার জন্মলগ্নে শাঁখ ও উলুধ্বনি যেমন বাজেনা, তেমনি অকালে ঝরে গেলে পাড়া শুদ্ধ 'ওগো আমার কি হলো গো'—বলে পা ছড়িয়ে ডাক ছেড়ে আর্তনাদ করতেও বসে না।

গল্প সংখ্যা কৃশানু সম্পর্কে— সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ছোটগল্পের মন্দা শুধু এদেশে নয়, বিশ্ব জুড়েই। হয়তো 'গল্প' নামক ঘনমনোহর ব্যাপারটার খাতিরে নেহাৎ ভুল করে এই শিল্প পণ্যের বাজারে জায়গা পেয়েছিল। ক্রমশ ধরা পড়ে গেছে, এ জিনিস আসলে ঘর সাজানোর কাজে ব্যবহার করা যায় না। বাজার মানেই তো ভিড়ের জায়গা। ভিড় শিল্পের যা কিছু কেনে, তা ঘর সাজাতে কাজে লাগবে বলেই কেনে।

কিংবা আরও সব কারণ আছে। প্রযুক্তির চাপে মানুষ বহুবচনে অর্থাৎ ভিড়ে পর্যবসিত। তার প্রাতিস্বিকতা অবশিষ্ট থাকছে না। এবং তাই দার্শনিকতা থেকে ব্যক্তিসত্তা বিযুক্ত হয়ে পড়ছে। ছোটগল্প মানেই একেকটি দার্শনিক বিচ্ছুরণ, ব্যক্তির প্রিজমে।

কিংবা হয়তো আরও কারণ আছে।

কারণ নিয়ে ভেবে লাভ নেই। ছোটগল্প লেখকের অতঃপর নিয়তিবাদী হওয়াই নিয়তি। আমি এই সারকথা ভেবেই এখনও মরীয়া হয়ে ছোটগল্প লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। অন্যে কেন করছেন, জানি না।

তবে 'কৃশানু' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাটি পড়ার পর মনে হল, সত্যি কি এত সিনিক হয়ে পড়া উচিত হচ্ছে? অন্তত কয়েকটি গল্প—যেমন প্রভাসকান্তি ভদ্রের 'স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী', রবেশ্বর বর্মণের 'খাই খাই', শান্ত রায়ের 'জানালায় এপাশে', মদন দাসের 'খোলস', পড়তে পড়তে রীতিমতো রোমাঞ্চিত হয়ে ভেবেছি, ছোট গল্পের আঙ্গিকগত এত উৎকর্ষ সত্ত্বেও কেন ছোটগল্প লেখকরা মাথা নীচু করে হাঁটেন? প্রচলিত রীতিতে লেখা গল্পগুলোও কুশলতার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যখন ছোটগল্প লেখক হিসেবে হারানো সাহস ফিরে পাই। নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের 'নান্দীপাঠ' বক্তব্যবাদী রচনা, কিন্তু আঙ্গিকের ব্যাপারে নিপুণতা প্রগাঢ়। দীনেশচন্দ্র সিংহের 'আনমনে' প্রতিশ্রুতির স্পষ্টতা আছে। সব গল্পের নাম করছি না, কৃশানু শারদীয় সংখ্যাটি সাজিয়েছেন বেশ উজ্জ্বল ফুলে ফলে। ছোটগল্প হয়তো একদিন আবার হারানো জমি ফিরে পাবে, এ বিশ্বাস না করে পার নেই।

কবিতাবলী

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

রাজপথে ঘুরেছি সারাদিন, তবু কোনো রাজাকে দেখিনি।
না হয় আমার নেই রাজ্যপাট,
আমি একা থাকব মহারাণী ?
তোমারও কি পাব না সাক্ষাৎ ?

তোমারই ইচ্ছায় প্রভু, পৃথিবীতে এসে গেছি
তোমারই ইচ্ছায়।
এখানে এসেই দেখি, ফুটপাথ দখল করছে স্বর্গভ্রষ্ট বাড়তি
দেবতারা—
আমরা তবে দাঁড়াই কোথায় ?

৩. ধার করেছি রোগের অষুধ, পথ্যিটথ্যি এবং টাকাকড়ি—
সেজন্যেই তো ভয় কাটে না, পাওনাদারের ভয়।
এবার একদিন ইচ্ছে আছে ফুর্তিটুর্তি করে আসব গড়ের
মাঠে গিয়ে,
হঠাৎ যদি ফুরিয়ে যায় ধার-করা এ সময় ?

অহেতুক

মদন দাশ

প্রত্যহ
কিছু কিছু বিষণ্ণতা জমে
বুকের মধ্যে।
এইভাবে অতিক্রান্ত হ'লে কিছুকাল
একদিন
আমি এক মৃত সত্তা
বহুকাল পৃথিবীতে জীর্ণ বসে আছি
এবম্বিধ অনুভব বুকের ভেতর স্থায়ী
ডিমে তা দেওয়া পাখীর মতন।

ডিম ফুটলে আরও কিছু বিষণ্ণতা
ছোট ছোট ডানা মেলে উড়তে চাইবে—
এসব জেনেও আমি
খুঁটে খুঁটে আহার সংগ্রহ করি,
পায়ে পায়ে জড়ো করি জীর্ণ বসন,
নষ্ট শস্য, মৃত সব পাখীর পালক,
খড়কুটো, ভাঙা খেলনা,
ম্লান আলো, শ্যাওলা আঁধার।

পথচারী জানে না এসব

শিবাজী গুপ্ত

নিজস্ব লাইব্রেরিতে পা রাখলেই কে যেন তির্যক চোখে তাকিয়ে থাকে
আলো নিবে গেলে অন্ধকারে জিজ্ঞাসার আগেই জবাব মিলে যায়,
হায়, সহস্র কবিতার বন্দী থাকি আমি
আমাকে ঘিরে থাকে সময়ের সহস্র কবিতা
কান পাতলেই টের পাই বেটোভেন
চোখ খুললেই তুমি আছো যামিনী
এভাবেই দিনে দিনে প্রতিদিন রঙে রঙে খুলে যায় রঙবাহারের মজা
এখন ভাঙা কার্নিশ দেখলেই রাজমিস্তিরি মনে পড়ে
কার্নিশের খুব কাছাকাছি শুয়ে থাকে কর্ণিক শব্দটা
এককণা দুঃখ তাতে লেগে আছে বুঝি
আমার মুখে গালে লেগে রয়েছে তোমার ঘাম
উল্টো হাতে মুছে নিই, দেখি
কে কার জয়যাত্রায় ফুল ছড়াচ্ছো দেদার হাতে বারংবার
ছেঁড়া ইস্তাহারগুলো ঘরময় উড়ছে
আর কবি ক্রমেই নিরক্ষর হতে থাকে
তার ঠোঁটের নিচেই কেন সুধাভাও থিরথির কাঁপে
কার ছিন্ন টুপি পুরনো মুকুটের মতো গড়াতে থাকে নর্দমার দিকে
নগর স্বভাবে মাতে কোন্ অহংকারী
চোখ বুজলেই জলের ভেতর দৌড়ে যায় ঘোড়া
চোখ বুজলেই ধানক্ষেতে ফকিরের চাউনি
বিরহী গ্রাম আর পটুয়াপাড়ার দুঃখ
পথচারী জানে না এসব

পথচারী সারমর্ম জানে

শ্রুতি

রবীন সুর

সে-আঁধারে নির্বাসন নিতে পারি। শ্রুতির বেতারে
যখন সূর্যাস্তদৃশ্য মিশে যায় ধমনী প্রবাহে
নিঃশব্দ সাউণ্ডট্রাকে আদিগন্ত সমস্ত পৃথিবী
ছবির ফোয়ারা তুলে রামধনু উদয় বিস্তার।

নদীর জন্মের কথা, আকাশে জলের ছবি, নদীতে আকাশ
সহস্র প্রজন্ম কথা দৃশ্যে অঙ্কে কাহিনী মুখর কুশীলব
সান্নিধ্যে প্রগাঢ় হচ্ছে ; চোখবন্ধ তবুও ছায়ার
মিছিলে মিছিলে মুখ, মুখে মুখে নামের যৌতুক।

শব্দের মাদকবৃত্তি আবগারি বিভাগের নিষেধ ধমকে
শমিত হবার নয়, স্নায়ুকোষে রক্তে রক্তে সে তার সংক্রাম:
নারীকে কাছিয়ে আনে অনায়াসে, জন্মমৃত্যু বৃত্তান্তের কথা
একাই শোনাতে পারে বহুমাত্রা ঘৃণা-ক্রোধ-বিনয়-বিদ্রোহে।

শব্দের ঈশ্বর তার অলৌকিক করুণার হাত
শুশ্রূষায় মত রাখে পীড়িতের ঘর্মাক্ত আত্মায়।

ভ্রমর খুশী

ফণী বসু

ভ্রমর খুশী মন পেয়েছি ইচ্ছে হলেই উড়তে পারি
তাই বুঝি তোর বা হাতে ফুল ভান মুঠিতে রয় হাতুড়ী
মায় না ছুঁড়ে পারিস যদি
উড়তে পারার এইতো মজা, পায়ের নীচে সকল নদী

সিঁকোয় তোলা পদার্থটি খুলিয়ে রেখে কি লোভ দেখাও
দোর দরজা বন্ধ রেখে খিড়কী দিয়ে চোখ মেরে চাও
সব রসেরই অমৃত প্রাণ—বললো কেরে
বন্ধ্যা নারীর কাঁদছে উঠান

ভ্রমর খুশী মন পেয়েছি ইচ্ছে হলেই উড়তে পারি
তোর বাগানে 'প্রবেশ নিষেধ'! আমি কি তোর দোর ভিখারী
গুনগুনিয়ে উড়তে জানা
এইতো আমার দিব্য পূজা কোন দারোয়ান করবে মানা।

ভ্রমর খুশী মন পেয়েছি ইচ্ছে হলেই উড়তে পারি
পায়ের তলায় ভাঁতলে মাটি, ডানায় পাড়ি
আমি কি তোর দোর ভিখিরী!

দেখে শুনে বসে আছি, বেমালুম, বুরবক্ হোয়ে

রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়

দেখেছি শুনেছি সব—
দেখে শুনে বসে আছি, বেমালুম, বুরবক্ হোয়ে।
এ্যামনও সোময় গ্যাছে
এ্যাকা আমি, অনায়াসে পেরিয়েছি
বছরের ছ'টা ট্যুর সুচতুর।
হয়তো বা ছ'টা শিশু, ছ'টা ট্যুর পার হোতে
ছ'-ছ'টা বর্ডারে গ্যাছে নিঃশেষে ক্ষোয়ে।
দেখেছি শুনেছি সব—
দেখে শুনে বসে আছি, বেমালুম, বুরবক্ হোয়ে।

একটা যুবতী ফুল
নিজেকে গোপন রেখে সুচতুর।
এ্যাকে এ্যাকে পায় হয় বছরের ছ'টা ট্যুর—
গ্রীষ্ম.....
বর্ষা.....
শরৎ
হেমন্ত.....
শীত.....
বসন্ত.....এ্যাতোদূর।
এখানেই মৃত্যু হয় তার।
যেটুকু গোপন ছিলো ;
যোনিদেশে যেটুকু পাপড়ি ছিলো ঢাকা,
লক্ষ কোটি কীট তাও ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে দিলো ছিঁড়ে
নৃশংস মির্মম ছোঁ-এ।
দেখেছি শুনেছি সব—
দেখে শুনে বসে আছি, বেমালুম, বুরবক্ হোয়ে।

ব্যর্থতা

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

বেদনা হলোনা সোনা, পুড়ে পুড়ে রক্তমুখী মাটি
রুক্ষ রূঢ় নিরুদ্ভিদ, দুঃখে ও দহনে দিলে না যে
দারিদ্রে কি হলো আর, মিথ্যে ঝরে গেল ঢের বেলা
কিছুই দিলো না কেউ শুধু শতচ্ছিন্ন স্বপ্ন
বুকের আরক্ত জলে ভাসে।
আমার আকাঙ্ক্ষা ঘিরে ঘন যামিনীতে শুধু তার
তীক্ষ্ণ ভালোবাসা ছিল আলোতে ছায়াতে চারপাশে
নিষ্করুণ কারুকার্যে ভরেছে সে অন্ধকার আমার প্রহর
ফুটেছে চম্পক ঘন বেদনায় এক একটি নিবিড় নীল শ্লোকে।
বেদনা হলো না শোনা, সব দুঃখ করে না মহান
কাউকে যন্ত্রণা শুধু দগ্ধ করে দীর্ঘ অন্ধকারে
সব কণ্ঠে সফলতা মালা হয়ে দোলেনা তা জানি
এক একটি কাহিনীহীন অন্ধরেখা কারো গল্প আঁকে।

এখন

অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়

ইচ্ছে হলেই চলে আসবে যখন তখন
পুরানো দিনের বন্ধুরা সব
হারিয়ে যাওয়া অনেক স্মৃতি
জমানো আছে। শুধু কিছু অনেক দিনের চঞ্চলতা
হয়তো তাদের নেই প্রয়োজন
অনেক কালের প্রাচীন কথা।
কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেও কয়েক প্রহর
যুদ্ধ এখন প্রতিদিনই আত্মহত্যা পণ।

ঝাউতলায় সন্ধ্যা

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

এখানে এখনই সন্ধ্যা এলো
ধূসর আকাশ থেকে খসে গেলো তরল অন্ধকারের ঢেউ
নিথর গাছের ডালে শেষ ডাক দিয়ে গেলো কাক
সামনের বনস্থলীতে কেঁপে কেঁপে ফুরিয়ে গেলো পৃথিবীর শিরায় যৌবন
আমার নিঃসঙ্গ শিথিল হাতে অবিশ্বাস্য ভারহীনতা
বুকের পাঁজরে রক্তের দাগ
হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ির ঘা
জরার বাহুবন্ধনে কাতর প্রার্থনা জানায় বুকের ভালবাসা
নিঃসঙ্গ চিলের ডানায় ফুরিয়ে যায় বিকেলের ঘ্রাণ।
শ্রাবণী কোথায় এখন মনে পড়ে পাঁজরের কান্নায়
নবনীকোমল শিশু তার খেলা করে রান্না ঘরের বারান্দায়
শ্রাবণীর গা-ধোওয়া হয়ে গেছে শেষ
বেলজিয়ম দর্পণে তার মুখ ভাসে
কপালে সিঁদুর টিপ
আকাশী রঙের সাড়ির আঁচলে জড়িয়ে আছে রাত্রির ভালবাসা।
ঝাউতলায় সন্ধ্যা এলো
এখন আমার মনের গ্রন্থি খুলে যায়
এই সন্ধ্যা এখনই রাত্রি হবে
পৃথিবীর সব ভালবাসা পাহাড়ী নদী হয়ে
বয়ে যাবে নগরে বন্দরে
রাত্রির সব অন্ধকার আলো হয়ে ভেসে যাবে
উচ্ছল ঝরণার আবেগে
এই ভালবাসার জন্যে আমি কাঙাল হয়ে
যেতে পারি দূরবর্তী বনে
কোনো এক নির্জন দুপুরে

সেখানে পাপিয়ার তরল কণ্ঠে গান শুনে শুনে
পবিত্র ইচ্ছায় বন্যায় ভেসে যেতে পারি।
শ্রাবণী চিরকাল থাকুক গৃহের ছায়ায়
নবনীকোমল শিশু তার খেলা করুক রান্নাঘরের বারান্দায়
আমি শুধু নিরক্ত স্মৃতি দিয়ে ঘিরে রাখবো
পৃথিবীর সব কুমারীর, সব প্রেমিকের দুরন্ত দুপুর।

প্রাত্যহিক

দীপ সাউ

প্রতিদিন পূর্ব দিগলয়ে ওঠে
একটা নির্দিষ্ট তালে তাপ দেয় সূর্য।
অভ্যাসবশত বদ্ধ গলিতে ঘাসেরা কাঁপে
অভ্যাসবশত বৃষ্টির আগে শিঁপড়েরা খোঁজে আশ্রয়।
নিয়মিত গোলায় ফসল জমাতে নারীর আর ক্লান্তি আসে না।
রোমাঞ্চও না।
তবু ঘটে যায়
পূর্ব দিগলয়ে রঙ ছড়ানো
ঘাসের কাঁপন
সাদা ডিম নিয়ে লাল পিঁপড়ের সারি।

নরকেও যেতে পারি

তাপস মিত্র

নিশ্চিত প্রত্যয়ে জেনো
নরকেও যেতে পারি
এক মুঠো ভিক্ষা নিতে,
আবাল্য কৈশোর-স্মৃতির কণিন,
ঘরকন্না—এই সব ছত্রখান।
দু হাতে দু পায়ে,
সহজেই দেউলে হোতে পারি।
ঝরাপাতার অজস্র বিকেল
ভালবাসার সংক্রামক ব্যাধির,
বিকলাঙ্গ সান্ত্বনা হানে প্রার্থনা সঙ্গীতে
হেঁট মুখে বিধাতার অসুখের সুখ
অসুস্থ সাবধানী চোখ,
অথচ আমার সে অনিষ্ট ভালবাসা
'তাতল সৈকত বারি বিন্দু সম'
থর থর শীতের উত্তাপ,
একটু একটু করে শুষে নিতে পারি।

নিশ্চিত প্রত্যয়ে জেনো—
সহস্রাক্ষ বিকেল আর নিহতকে ফিরে পেতে
নরকেও যেতে রাজি।

চোখ

বঙ্কিম চক্রবর্তী

নারীরা ভীষণ ভাবে কাঁদতে পারে কি? নারীরা?
আমার প্রত্যাশিত চিঠির জবাব দেয়নি ইরা
মূলত: বসন্ত বিষয়কী কবিতায় চৈত্র ছট্‌পট্‌ করে
তেমনি কুমারী হৃদয় না কি কখনও কখনও জ্বলে-পুড়ে
এক সেকেণ্ডে ছাই হোয়ে যায়।

নারী বিষয়ক কবিতা লিখিনা, নারী বিষয়ক
আমার সমস্ত জবাব দিয়েছে ইরা : তা হোক্
আমিও দু:সময়ে কাঁদতে পারি—এই সুখ
অসুখ-বিসুখ এ যেন কতোনা উজবুক।

পাগলরা ভীষণ ভাবে কাঁদতে পারে কি? পাগলরা?
দোষ কি তার? দোষী ওই চোখ এক জোড়া।

গবেষণা : ভ্রূণ থেকে শব

প্রণবকুমার পাল

মাতৃ গর্ভ থেকে
শ্মশানের অলিন্দে থামি।
গবেষণা : ভ্রূণ থেকে শব

তোমাকে আবিষ্কার ক'রে
জন্ম বা মৃত্যুকে পাই না,
অথচ এখানে অনুভব।

তুমি আমি উলঙ্গ সবাই

সমীর সেনগুপ্ত

তুমি আমি উলঙ্গ সবাই,
নগ্ন, হয়তো বা আরো কিছু,
অন্য কোনখানে নয়,
এই এখানে, বুকের ভিতর, তোমার, আমার।
চিরদিন পৃথিবী এইখানে ছিল না,
বাইরে থেকে আত্মমুখী করে
ওকে ভিতরে এনেছি।
সব কিছু ওর এই বুকের ভিতর—
যাবতীয় রক্তপাত।
এই প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে প্রাসাদ ;
রক্তহীন বলি কি করে ?
ক্রমাগত এইটের মধ্যেও কিছু
ধুলো ওড়ানো বাতাসের আনাগোনা
ব্যাপ্ত হয়ে
হাতের মুদ্রায় এসে জমে—
হঠাৎ রাতারাতি
তুমি, আমি, অস্থিসার, উলঙ্গ সবাই।

আমিও ধূসর হবো

বিপ্লব চন্দ

হয়তো ফুলেরা আর ফুটবে না অফুরাণ
আমিও ধূসর হবো।
হয়তো সবুজ গাছ সেও চাইবে ব্যঙ্গ ক'রে হেসে উঠতে এক গাল।
চাঁদের মাথায় আর দেখবো না মাটি
প্রেম সেই এক হবে ; উচ্চারণে এনে
বিদায় নিয়ে যাবে বহুদূর ; অথচ আমারই মত
ছোবলানো কোন জীব চিরকাল স্বশরীরি থাকে—
কেউ রাখে না জল ; অকাতর পাত্র।

সব গাছ প্রাণহীন ধূলায় একাকার হ'য়ে আছে

ভেবেছিলাম তুমি

দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দেবদারু গাছটাকে আনা গেল সূর্যাস্তের সামনে
এবং
দুপাশে রইল এক ফ্রেমের আকারে
কিছু বাড়ী কিছু নীল ফুলঝুরি
জাফরি-কাটার মত এঁকে দিল সাধের সমুদ্র

ছবিখানা দেখে যেতে থাকলাম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে

হঠাৎ অসংখ্য
দেবদারু গাছে ঢেকে গেল
সূর্যাস্তের ছবি
নীচে পরিণতিহীন এক শিশু
শায়িত বাগানে

চোদ্দ বিঘের বাড়ীটা

কল্লোল বিশ্বাস

প্রশান্তা, নীরবতা কুমকুম ভোরের আলোতে :
মধুক্ষরা ইছামতী, ঢেউ, স্রোত নৌকা চলমান।
গেরুয়া জলের রাশি ওইপারে থেমে গেছে চরে
বালুক্ষেত, আম, বাঁশ, শ্যাওড়া, হিজল, বনবন।

মন দিয়ে হেঁটে যাই চর ছেড়ে গাছ ছেড়ে দূরে
আমার জন্মের দেশে অনেক আশার সেই দেশে ;
নরম মাটির গন্ধ, মেঠোপথ, মধুমতী নদী
জাগ্‌লি ধানের আটি, বিলজমি, ধুলজুড়ী খাল।
কাসার গেলাসভরা গাঢ় মিষ্টি খেজুরের রস
কোমরেতে ছ্যানদাও ভোলাই গাছির হাসিমুখ।
হেলেঞ্চার হাটে কিংবা বানারহাটের বটতলা,
আড়ঙের মাঝে কিবা মধুশালী ধান ক্ষেত পর,

বটের ছায়ার নীচে বাস্তুপূজার দুপুরেতে
নিমাই সন্ন্যাস কিবা রামায়ণ পালার আসরে
অনেক কুশল প্রশ্ন অনায়াসে স্বাভাবিক স্বরে
অনেক দুঃখের কথা ভয় আশা খবরের ঝুড়ি।
মধুমতী নদী আর দীঘর বিলের মানুষের।
কোনদিন ভাবেনাই জন্মদেশ মৃত্যুদেশ নয়।

পণ্ডিত বানার মাঠ, শ্যাওড়ার নিশানাথ তলা
মধুমতী, জলামাঠ, ডোঙা, নৌকা, কই, নল মাছ
বহুতর দূরে : ছড়ানো মানুষ সব স্থানে স্থানান্তরে।
আম, নারকোল, জাম, গাঙ, জল, হাট, মাঠ ছেড়ে
আমিও এসেছি চলে কোন এক অবসর দিনে।

সুখে দুঃখে আশা নিরাশায় কখনো বা শোকে ডুবে
কিশোর কালের দিন কাটায়েছি যে বাড়ীতে আমি,
নিশানাথ ঠাকুরের পাশে সুপ্রাচীন সে আবাসে
গভীর মমতা বুকে নিয়ে সুমহান নরনারী সব
কাটায়েছে দীর্ঘদিন সহজ সরল সমারোহে।
পালান, পুকুর, কাচা, পূজোভিটে, গাছ ফল ফুল
ঠ্যানঠেনে শাক, কচি ডাব, কানাইবাঁশীর আম।
সেই চোদ্দ বিঘের বাড়ীতে রাধানাথ আসবেনা
বড়কর্তা বলে ডাক দিয়ে ; কপালে সিঁদুর পরা
কুক্ষচুল লাঠিয়াল নতুন মাটির পাত্রে এক মনে বসে
যবেনাকো রামদাও। সেই সব যুবরাজ রাণী
সেনাপতি, রাম সীতা, পালার আসরে ঝলমল
ডুবে গেছে ঘন অন্ধকারে চিহ্নহীন বহুদূরে।
গাবের শ্যাওড়ার ডালে হয়তো বা তারা আজ আছে
শূন্যতার বার্তাবহ জোনাকির মৃদু আলো হয়ে।
যুদ্ধের গল্পের তরে জমায়েত মানুষের দল

যাদের ধারণা ছিল বারোহাত সেপায়েরা সব
যুদ্ধ করে কুড়িহাতে বর্শা আর অতিকায় ঢালে
এখন কখনো আর আসবেনা উঠোনের পরে।

গোলেবকেয়ালী পরী বেঁচে নেই সেই দেশে আর
ঠাকুমা ও জ্যোঠামহাশয় রূপকথা বলে নাকো।
ঠাকুমার সেই কথা—জীবনের দাম লক্ষাধিক
কোনদিন মরবোনা—শুনবোনা আমি সেই মুখে।
দিদির বিয়ের দিনে, কার্তিক পূজোর দিন এলে
হালা দেয়া নিকানো উঠানে খুশী মনে নেচে চলা।
খালবিল, ধানক্ষেত, মটরের শুঁই, তিলফুল
হুজো, বৈশু, রাজা, সন্তোষ, খগেন, অনিল ছিল।

সেই মহাদেশ হতে অগৌরবে খসে আসা আমি
জীবনের বজ্রালোকে মুখোমুখি মহাসন্ধিক্ষণে।

জানা নাই কতদিন হবে পথ চলা
শ্যামল কখনো রুক্ষ এ মাটির পথে।
ধারা আজ চলে গেছে ঘন কুয়াশায়
মিশে আছে ঘাস আর গাঙের জলেতে
জানে নাই পথ যেতে যেতে কোন খানে
থেমে যাবে অবসাদে কোন গোধূলীতে।
চলার পথের পাশে কোন এক দিন
বসে যাবো চলা আর হবেনা কখনো।
মধুমতী খালবিল হিজলের থেকে
তখন থাকবো আমি অতিশয় দূরে,
সেখানে কল্পীর দাম রাখবেনা ঘিরে
পরম আদরে সেব মহা চিহ্ন টুকু।

জঙ্গমে স্থাবরে বড় একা

স্বপন চক্রবর্তী

জঙ্গমে স্থাবরে বড় একা হয়ে গেছি। ভুল বুঝে স্বজনেরা সব কে কোথায়
চলে যায়। শূন্য মঞ্চে পড়ে থাকা অভিনেতার পদধূলির মতো ধূলা
পড়ে থাকে
হৃদয়ের কার্পেটে। যে গন্ধ ধূপ নিভে গেছে, শুধু তার বাস
ভেসে বেড়াচ্ছে কুয়াশার মেঘের সজ্জায়
কার ভুল, কি ভুল কিছুই জানিনা। তবু বুকের গভীরে ব্যথা হয়
চোখ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে জল। হাতের জ্যামিতিক
কর পল্লবে
কর মর্দনের লোল উষ্ণতা
ভিজে ওঠে, ভিজে যায়।

তবু ফুল তোমাকে ফুল বলেই ডাকব
নারী তোমাকে ডাকব নারী নামেই
পুরুষকে বলব পুরুষ
পাখিকে ডাকব পাখি বলেই
যেন এছাড়া ওদের অন্য নামে ডাকা গেলেও
কোথাও কিছু কিছু তফাৎ থেকে যায় অশেষ
লজ্জাকর চোখের জল মুছে দেবে নার্স মমতা।
জঙ্গমে স্থাবরে বড় একা হয়ে গেছি। স্বজনেরা কেউ কেউ চলে গ্যাছে
মনস্তাপে খেলো হুকোয় মুখ রাখলে মনে পড়ে যায়
এই খানে বন্ধুদের মুখ
যেন তাই সন্তর্পণে মুখ রাখি। যদি
এইখানে নালের দাগে আপোষের স্মারক থেকে থাকে
যদি ক্ষমা থেকে যায়।

অসময়

তেজেশ অধিকারী

সুখে থাকো পারিজাত ফুল
বেলা গেছে
যাদুকাঠি অন্তর্গত ভুল
বেলা গেছে

হে সময় আমাকে জাগিয়ে তোলো
শুদ্ধ মানুষের মতো

রক্তে নাচে পারিজাত ফুল।

চিরকুট

প্রফুল্ল মিশ্র

চিরহুটে ঠিকানাটা লেখা ছিলো

কোথা যেন রয়েছে সময়
সকাল দুপুর রাত তোলপাড়
আলমারি ডেসক ডায়েরি বিছানা ওয়াড়
ক্যালেনডারের কোণা

কখন কী হয়
বড্ড বেখেয়ালে এই পথ-টথ চলা ঠিক নয়
হয়তো বাসাটা বদলে গেছে :
(শিশুরা তো বড়ো হয়ে যায়ই।)
পুরনো ক্যালেনডার নামে, চুনকাম পালিশ টালিশ
বিছানা বালিশ

এক বিনিদ্র রাতে

আশিষ ঘোষ

ঘরে
রাত্রির কালো মেঘ
নিঃসীম আঁধার
একটুও আলো নেই কোথাও

মশারিটার শত দিকে তালি
রাত্রির নৈঃশব্দ ভেদ ক'রে
বিছানাটা হঠাৎ
কর্কশ শব্দে ডেকে উঠলো।
টিকটিকিটা তারই সঙ্গে
সুর মিলিয়ে উঠলো হেঁকে।

সময় এগিয়ে যায়,
হঠাৎ একরাশ হাওয়া,
ধুলো ভর্তি ঘর,
নড়বড়ে বিছানার মাঝে মাঝে আর্তনাদ,
তবু বেশ লাগছে।

একরাশ কোঁটা কোঁটা বৃষ্টি
খোলা জানালা—
আবার
তীব্র কর্কশ শব্দ
বিছানার নয়—বজ্রপাতের।

'মুক্তি' ও শরৎসাহিত্য

ডঃ বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

'ভাবে, কাজে, চিন্তায়, মুক্তি দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ। সাহিত্য যদি বাস্তবিক মুক্তির ব্যাপার হয়, তবে আমাদের সাহিত্য একেবারেই পঙ্গু।' কথাটা শরৎচন্দ্রের। বলেছিলেন, ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ' (বরিশাল শাখা) কর্তৃক প্রদত্ত সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তরে। এই বছরই 'দেনা-পাওনা' প্রকাশিত হয়। তার আগেই 'পল্লী সমাজ (১৯১৬), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), শ্রীকান্ত (১ম ও ২য় পর্ব) এবং 'গৃহদাহ' (১৯২০)-এর মত উপন্যাসগুলি লেখা শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং পরিণত চিন্তাশক্তির অধিকারী শিল্পীই এই মন্তব্য করেছিলেন। তবে ব্যাখ্যা বিস্তারিত নয় বলেই প্রশ্ন ওঠে, এখানে শরৎচন্দ্র কি ধরণের মুক্তির কথা বলছেন?

সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা যে ধরণের মুক্তির কথা বলেন এখানে কি সেই মুক্তির কথা বলা হচ্ছে? প্রশ্নটা যে জাগছে তার কারণ আছে। এই মন্তব্য প্রকাশের পরের বছর ১৩৩১ বঙ্গাব্দে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্র বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে লিখেছেন, 'রুশ সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।' আরও বারো বছর পরে বলছেন, 'সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রাশিয়ার গন্ধি প্রভৃতিকে ভাল লাগে।' তিনি যখন রুশ-সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রকাশ করছেন, তার তিন বছর পরেও (১৩৩৪-এ) রবীন্দ্রনাথ 'লাল টুপি পরা' নবীন গুরু বলে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সাহিত্যিকদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন এবং বিদ্রূপ করে লিখেছেন 'উপরওয়ালা রাশিয়ান হেডমাস্টার' কথাটা। অতএব বাঙলা সাহিত্য জগতের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ যখন রুশ সাহিত্য সম্পর্কে বিরাগ প্রকাশ করছেন, বিরক্তি প্রকাশ করছেন কম্যুনিস্ট রাশিয়ার সাহিত্যের প্রতি নবীন

সাহিত্যিকদের অনুরাগকে, তখন শরৎচন্দ্র কামনা করছেন রুশ সাহিত্যের মত সমাজের নীচু স্তরের মানুষের সুখ দুঃখ ও বেদনার কথা বাঙলা সাহিত্যে ফুটে উঠুক। রুশ-সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরাগ থেকে মনে হচ্ছে, ১৩৩৪ নাগাদ অর্থাৎ যে সময় 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি তিনি লিখেছেন সেই সময় রুশ সাহিত্যের একটা প্রবল প্রভাব অনুভূত হচ্ছিল বাঙালী সাহিত্যিক ও সাহিত্য পাঠকদের মধ্যে। রুশ-ঘেঁষা রুচি সুরছিল হাওয়ায়। নবীনদের টানটা ছিল সেইদিকে। যে বাস্তবতার দিকে ঝুঁকেছিলেন তাঁরা, সেই বাস্তবতার অন্যতম পিঠস্থান ছিল রাশিয়া। নবীনদের অনেকেই ইংরেজি সাহিত্যে ছিলেন সুশিক্ষিত, অনুবাদের মাধ্যমে নিশ্চয়ই ফরাসী এবং অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তাঁদের। সুতরাং এঁদের রুশ সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের অন্যান্য সাহিত্য সম্পর্কেও আগ্রহ জেগেছিল। উনিশ শতকের ফরাসী ও রুশ সাহিত্যে তথা সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে 'ন্যাচারালিজম্' ও 'রিয়ালিজম্' আন্দোলন হিসেবে দানা বেঁধে উঠেছিল, নবীনেরা মুগ্ধ ছিলেন সেই সমস্ত আন্দোলন সম্পর্কে। তারপর গোর্কির মত ঔপন্যাসিক 'রিয়ালিজম্' শব্দটিকে যখন সোস্যালিজমের সঙ্গে যোগ করে 'সোসালিস্ট রিয়ালিজম্' কথাটি সৃষ্টি করলেন, তখন সাহিত্যে 'রিয়ালিজম্' বলতে আমরা শুধু বাস্তবের স্বরূপোদ্‌ঘাটনই বুঝলাম না। বুঝলাম আরও একটু বেশী কিছু। সাহিত্য শুধু সমাজের বাস্তব চেহারার যথাযথ বিবৃতি দেবে না, শোষণমুক্ত সামাজিক জীবনের পরিচয় তুলে ধরবে, কোন্ পথে মিলবে অত্যাচারিতের জীবনে বাঞ্ছিত মুক্তি তারও সংকেত দেবে। গোর্কির পূর্বেই অবশ্য বেলিনস্কি, চেরনিশেভস্কি শিল্পীদের কাছ থেকে এই জাতীয় সমাজ চেতনা কামনা করেছিলেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই। বেলিনস্কির রাশিয়ার সামাজিক জীবনের সমস্যা যা ছিল, গোর্কির সময়কার সমস্যা তা থেকে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল অনেকখানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বেলিনস্কি সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি তিনি তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং সাহিত্যেও কামনা করেছিলেন সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতিচ্ছবি তাতে একজন মুক্তমতি দার্শনিক হিসেবে তাঁকে চিনতে আমাদের ভুল হয়নি। রাশিয়ায় বেলিনস্কি ছিলেন ভাববাদী হেগেল দর্শনের মূর্তিমান প্রতিবাদ।

বিশ শতকের গোড়ার দিকের বাঙালী সাহিত্য পাঠকেরা যেমন টলস্টয়-গোর্কি পড়েছিলেন, তেমনি জানতেন বেলিনস্কি, ডোব্রোলিউবভের কথা। আবার আমাদের দেশের রাজনৈতিক জীবনে যদিও গান্ধীজীর দ্বারা অসহযোগ সত্যাগ্রহের মত নানা রকম আন্দোলন বিদেশী ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে দানা বেঁধে উঠেছিল তথাপি সেদিনকার ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন একমাত্র সেটাই ছিল না। সন্ত্রাসবাদ ছিল। কিছু পরে কম্যুনিস্ট পার্টিরও গোড়াপত্তন হয় মুজফফর আমেদ ও তাদের নেতৃত্বে। সুতরাং নানা দিক থেকেই শাসকশক্তি বিব্রত হয়ে উঠছিল। মোট কথা রুশ সাহিত্য, রুশদেশীয় কম্যুনিস্ট পার্টি সব কিছুই ওরুশদের টানছিল। শরৎচন্দ্র রুশ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। টলস্টয়ের 'রেজারেকশনের' কথা 'চরিত্রহীন' প্রসঙ্গে একাধিকবার বলেছেন, গোর্কির কথা বলেছেন এবং তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে রাজনৈতিক জীবনে হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু কেন? ভিতরের কারণটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু 'নাগরিক' পত্রিকার ১৩৪১-এর শারদীয়া সংখ্যায় একটা কথা বলেছেন যা আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়—'তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজম্‌কে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকেরা ব্যবসায়ীরা। সমাজ-তান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি ক'রে? এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।' গান্ধীজীকে ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র উভয়েই শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর রাজনৈতিক প্রশ্নে মত পার্থক্য ঘটেছিল এবং উদ্ধৃত মন্তব্যে গান্ধী নীতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বক্রোক্তিও চোখ এড়িয়ে যাওয়ার নয়। জানি না, ভিতরে ভিতরে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোন আকর্ষণ থেকে শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন কিনা। তবে শরৎচন্দ্রের চিন্তার জগতে রুশদেশীয় সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের প্রচারক রুশ সাহিত্য বেশ কিছুটা আকর্ষণ বিস্তার করেছিল, এটুকু সিদ্ধান্ত হিসেবে মানতে আপত্তি নেই আশা করি। যে উদ্ধৃতিটি দিয়ে প্রবন্ধের শুরু করেছি, এখন মনে হচ্ছে সেই মন্তব্যের পিছনে রুশ সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ কারণ হিসেবে বর্তমান ছিল। আবার অন্য যুক্তি দিয়ে আমার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা যাবে না তা বলি না। কারণ যিনি এই কথাগুলো বলেছিলেন, তাঁর নিজের সাহিত্য কর্ম থেকে

আমরা তাঁর মতের সমর্থন পাই না। উদ্ধৃতিটির দ্বিতীয় বাক্যে তিনি বলেছেন, 'সাহিত্য যদি বাস্তবিক মুক্তির ব্যাপার হয়, তবে আমাদের সাহিত্য একেবারেই পঙ্গু।' কমা চিহ্নের আগে পর্যন্ত যে বাক্যাংশ সেখানে একটি 'যদি' শব্দ আছে। 'যদি', 'কিন্তু', প্রভৃতি অব্যয়গুলি কোন যুক্তির মধ্যে থাকলে যুক্তিকে দুর্বল করে দেয়। এখানেও তাই দিয়েছে। তিনি কি বলতে চাইছেন—সাহিত্য বাস্তবিক মুক্তির ব্যাপার হতে পারে অথবা না-ও হতে পারে? এ সন্দেহ কেন? কোন শিল্পীর কাছ থেকে এটা নিশ্চয়ই কাম্য নয়। মনে হয় বাক্যের দ্বিতীয় অংশ 'তবে আমাদের সাহিত্য একেবারেই পঙ্গু' লিখতে তিনি জোর পাচ্ছিলেন না। যদি লিখতেন 'সাহিত্য মুক্তির ব্যাপার এবং আমাদের সাহিত্য একেবারেই পঙ্গু' অর্থাৎ 'যদি' এবং 'তবে' অব্যয় দুটো বাদ দিতেন তাহ'লে বক্তব্যটা জোরালো হত। কিন্তু নানা কারণেই সে জোর তাঁর ছিল না। প্রথম কারণ, সামনে দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁকে ঘিরেই চলছে ঝড়। তর্কের ঝড়। অটল গাম্ভীর্যে তিনি দণ্ডায়মান। যত বড় বীরই হোন আক্রমণকারী, তোড়জোর দূর থেকে, কাছে এলেই অবনত মস্তক। তাঁরও আগে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী ঔপন্যাসিক বঙ্কিম, যিনি তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে মরিয়াও 'অমর'। অতএব 'যদি', 'তবে' দিয়েই শরৎচন্দ্রকে কাজ সারতে হয়েছে। তা ছাড়া, কথাটা বললে নিজেকেও আত্মঘাতী হতে হচ্ছে তো! টলস্টয়ের মত অমন প্রশান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে কে আর নিজের আয়াসসাধ্য মনীষাউজ্জ্বল সাহিত্য কর্মগুলো বরখাস্ত করতে পেরেছেন? পঙ্গুত্ব থেকে তাঁর নিজের সৃষ্টিও যে বাদ যাবে না, একথা মাথায় রেখে শরৎচন্দ্র যদি ঐ কথাগুলো লিখে থাকেন তাহ'লে আমি কিন্তু তাঁকে প্রশংসা করি। সব সময় না হলেও অনেক সময়েই সাহিত্যিককে পাঠকদের রুচির দিকে তাকিয়ে গল্প, উপন্যাস লিখতে হয়। কবির এ ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনতা থাকে। কারণ তিনি ভিতরে ভিতরে ঠিকই জানেন, কাব্যবোদ্ধার সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু গল্প-উপন্যাস পড়েন এবং কিছু না কিছু বোঝেন এমন লোকের সংখ্যা তো বেশী। অতএব ঔপন্যাসিক পাঠকদের ফেলতে পারেন না। শরৎচন্দ্র নিজে একবার দুঃখ করে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন যে, দেশের লোকেরা রামের সুমতিকে মন দিয়ে গ্রহণ করল অথচ চরিত্রহীন সম্পর্কেই যত আপত্তি! চরিত্রহীন

আজকের বিচারে শিল্পকর্ম হিসেবে যত ত্রুটিপূর্ণই হোক, 'রামের সুমতি'র চেয়ে তার গল্পাংশের সম্ভাবনা যে অনেক বেশী ছিল তা ঠিক। কিন্তু যেহেতু পাঠকদের কাছে 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' অনেক বেশী আনন্দদায়ক, সুতরাং চরিত্রহীনের মত উপন্যাস চলবে না। যদি এটা কোন লেখককে বারবার বুঝতে হয় যে কতকগুলো আদর্শের মহিমা প্রচার ছাড়া পাঠকেরা আর কিছু চায় না এবং তার ওপর সে লেখকও যদি আর্থিক ব্যাপারে খুব স্বচ্ছল না হন তাহলে কি করবেন তিনি? কতদূর এগোবেন? তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, শরৎচন্দ্রের মধ্যে একটা যন্ত্রণা ছিল। সেই যন্ত্রণার কারণ একজন যথার্থ শিল্পীর সঙ্গে আগুতোষ পাঠকদের সমর্থন পিয়াসী গল্পকারের দ্বন্দ্ব। তবু তিনি এটা বুঝেছিলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে নেমে গেলে বাঙলা সাহিত্যে সুদিন আসবে এবং সাহিত্য যদি মুক্তির ব্যাপার হয় তাহ'লে বাঙলা সাহিত্য একেবারেই পঙ্গু, তিনি কেন কিছুটা এগিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না? তাঁর যে 'অভাগীর স্বর্গ' ও 'মহেশ' গল্প নিয়ে আমাদের একালের মার্ক্সবাদ বোদ্ধারা শিবনেত্র হয়ে পড়েন সেই সমস্ত গল্পে কি ধরণের সমাধানের পথ দেখিয়েছেন লেখক? কাঙালীচরণ যখন পাঁড়েজীর গলা ধাক্কা মুখ বুজে সহ্য করে অবশেষে খড় দিয়ে মায়ের মুখাগ্নি করে আকাশের দিকে 'হাঁ' করে তাকিয়ে রইল ধোঁয়ার রথে মা স্বর্গে যাচ্ছে ভেবে, তখন অবশ্যই পাঠক-পাঠিকার চোখ দিয়ে জল পড়বে, বিশেষ করে বয়স যাদের উনিশ পেরোয়নি। অত্যাচারের ছবিটা আছে, সামাজিক অসাম্যের অতি সত্য চেহারা আছে, সব মানি। কিন্তু সমাধানটা কি হল? 'মহেশ' গল্পেও দেখি একই অবস্থা। গফুর বেচারা আমিনার উপর চোখ রাঙাল কিন্তু যাদের জন্য তার একান্ত প্রিয় মহেশ এক মুঠো খড় খেতে পায় না, তাদের বিরুদ্ধে গফুরের অশ্রুসজল অভিযোগ উচ্চারিত হয়েছে দেবতার দরবারে। যে সময় কাঙালীর বা গফুরের পেশী দৃঢ় হয়ে ওঠা উচিত ছিল, সেই সময় তাদের ক্ষুব্ধ অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। যে সময় তাদের চোখ দিয়ে আগুন ঝরা উচিত ছিল সেই সময় তাদের দু' চোখ জলে ভরে উঠেছে। এই সমস্ত সামাজিক শোষণের পিছনে থাকে যে অর্থনৈতিক পরাধীনতা তা কি লেখক জানতেন না? যদি জানতেন তাহ'লে কেন সেই কারণ স্পষ্ট বিশ্লেষণ করলেন না? এটা হতে পারে একটা ক্ষুদ্রাকার গল্পে সেই সমস্ত বিশ্লেষণ সম্ভব ছিল না। অথবা,

যেকালের গল্প লিখেছেন তিনি সেকালে কাঙালী ও গফুর মিঞাদের ঐ ধরণের পরিণতিই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যে সব সমালোচকেরা গোর্কির ওপরেও শরৎচন্দ্রকে বসাচ্ছেন, তাঁদেরকে ভাবতে বলি, গোর্কির হাতে 'অভাগীর স্বর্গ' ও 'মহেশ' গল্পের কি পরিণতি হতে পারত? আসলে শরৎচন্দ্র দুঃখ-দৈন্য ও সামাজিক নিপীড়নের ছবি অনাবৃত করেছেন, কিন্তু দীর্ঘদিনের established সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটবে কোন্ পথে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অধিকারী ছিলেন না। সে ধারণা থাকলেও গল্প-উপন্যাসে তার প্রকাশ কোথায়? গোর্কি যে দু'ভাগে realist-দের ভাগ করেছেন শরৎচন্দ্রকে তার মধ্যে Critical realist বলে গণ্য করা যায়, Socialist realist হিসেবে নয়। গোর্কির পথ ছিল Socialist realist-এর পথ। শরৎচন্দ্র Socialism এর ভক্ত হলেও সেই পথের পথিক ছিলেন না। তাঁর উপন্যাসেও আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থন মিলবে।

'পল্লীসমাজ' ছিল এককালের পল্লী বাঙলার সমাজ-জীবনের দর্পণ। একালেও ঘটনাগুলো একেবারে মিথ্যে নয় যদিও রাজনীতি সচেতন পল্লীবাসীদের চেতনা আজকাল পাল্টেছে অনেক। বেণী ঘোষালেরা ১৯২৬-তে এবং তারও বেশ কিছুকাল পরে অবধি ছিল রক্ত মাংস সজীব। এখনও তাঁরা রয়েছে। তবে রাজনীতির পোষাক গায়ে চাপিয়ে। রমেশের মত আদর্শবাদী যুবক এখন রাজনৈতিক আদর্শে অনেক নির্যাতন সহ্য করে। আর বেণীরা তাদের চরিত্রহনন করে এবং সুযোগ বুঝে দল পাল্টায়। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে রমেশদের সংগ্রাম যেমন সেকালে ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনি একালেও ব্যর্থ হতে বাধ্য। একক মানুষের প্রচেষ্টায় সমাজের স্থিতাবস্থার বদল হয় না। তবু রমেশ লোকটা ভালো, আদর্শবাদী। গ্রাম্য নীচতার ঊর্ধ্বে। রমেশের লড়াই হয়েছিল যে রমার সঙ্গে তার বেশীটুকুই ভাবগত দ্বন্দ্ব এবং তার জন্য ছিল রমা-র একগুঁয়েমি। গোটা সমাজ ধীরে ধীরে রমা-রমেশের দ্বন্দ্বের মঞ্চে পরিণত হল। সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে বিধবা রমা-র গোপন হৃদয়ে রমেশের জন্য যে আসন ছিল পাতা, সেটাই সত্য হয়ে উঠতে লাগল। গ্রাম্য নিন্দায় তা যেন আরও স্পষ্ট হতে শুরু করল। রমার গোপন যন্ত্রণার বাহ্য প্রকাশ ঘটতে লাগল নানা তির্যক পথে। শেষ পর্যন্ত জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে রমা-র কাশীযাত্রা। সমাজ রূপ নিল ব্যক্তির মধ্যে। এমনিতেই উপন্যাসের

রচনার গুণে সমাজ সমস্যা রমা-রমেশের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে রূপ নিচ্ছিল। তারপর শেষে রমা-র পলায়নে ব্যক্তি মানুষের সমস্যাটাই উঠল বড় হয়ে। পলায়নের মধ্যে সমস্যার যে ধরণের সমাধান ঘটল তাতে সনাতন নীতিই জয়ী হল। রমার মত নারী শেষ পর্যন্ত হৃদয়দ্বার রুদ্ধ করে দ্বারুদ্ধ পাল্‌কীতে চেপে প্রৌঢ়া বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে কাশী যাত্রা করছে। যেহেতু রমা বিধবা অতএব রমেশকে ভালোবাসা ও তার পাপ, সে ভালোবাসা যত সত্যই হোক। এটা লেখকের বক্তব্য যদি নাও হয় তবু রমার কাছে তো ব্যাপারটা তাই ছিল। নইলে সে পালালো কেন? নিজের মনের কাছে হেরে গিয়ে এবং সামাজিক বিধি নিষেধের তর্জনী সংকেতে পরিচালিত হয়ে রমা-র এই কাশীযাত্রা কি প্রমাণ করে? একি নারীর চিত্তমুক্তির কথা? কিন্তু যদি শরৎবাবু রমা-রমেশের বিয়ে দিতেন তাহলে কি হত? বিয়ে হলেই সামাজিক কু-শাসন থেকে চরিত্রগুলি মুক্ত হত, সে কথা বলি না। বিয়েটা শস্তা সমাধান হ'ত এবং আমাদের সেকালের সামাজিক জীবনেও স্বাভাবিক হত না। তাছাড়া পল্লীসমাজে এই বিয়ের দ্বারা সামাজিক সমস্যার কোন বৈপ্লবিক সমাধানও হত না। তবু অস্বস্তি লাগে রমা-র কাশী যাত্রার ঘটনায়। আসলে সমাজের অনুশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেন নি শরৎচন্দ্রের নারীরা। তাঁরা মেনে নিয়েছেন মনু-শাসিত সমাজের দীর্ঘকালীন বিধিনির্দেশ। এমন কি যে রাজলক্ষ্মীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগ ছিল সে-ও আর সকলের চলাপথ অনুসরণ করেছে। তাছাড়া সামাজিক বিধি ধীরে ধীরে চরিত্রের গভীরে আমূল বদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যার হাত থেকে পাত্র-পাত্রীদের মুক্তি ছিল না। অথবা দিদি রাজলক্ষ্মী কে ছাড়তে পেরেছিল তাঁদের সনাতন মূল্যবোধ? পিয়ারী বাঈজী যে বন্ধুর মা তা কি সে ভুলতে পেরেছিল? অথবা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে সাপুড়ে বৃত্তি গ্রহণ করলেও সাহজীই যে তাঁর স্বামী ইহলোক-পরলোকের গতি, তা কি অন্নদা দিদি ভুলতে পেরেছিলো? অত্যাচারী লম্পট হলেও জীবানন্দই যে তার স্বামী ষোড়শীও পেরেছে কি তা ভুলতে? ভোলে নি বলেই সে আর সকলের পথ ধরে নি। শরৎচন্দ্রের নারীরা সকলেই তাঁদের প্রেমিককে বা স্বামীকে আঁকড়ে রেখেছেন, কখনও বাস্তবঃ, কখনও মনের গভীরে। এমন কি বিপরীত প্রতিবেশেও তাঁরা অসাধারণ প্রেম-বলে বলবতী। দিবাকরকে কেন্দ্র করে ছলনার জাল বিস্তার করলেও কিরণময়ীর লক্ষ্য ছিল

উপেন্দ্র। তাকে পাওয়ার জন্য কিরণময়ীর প্রচেষ্টার স্বাভাবিকতা নিয়ে সন্দেহ জাগে। কিন্তু তাহলেও শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্রের প্রতি তার আকর্ষণের অতি পরিচিত সহজ প্রকাশ তার হৃদয়কে স্পষ্টরূপে অনাবৃত করেছে জনসমক্ষে। প্রেমের আর এক রূপ এখানে। তবে সে প্রেমও কি সামাজিক নিয়ম নীতির প্রাচীর লঙ্ঘন করেছে? বঙ্কিমের রোহিণীর মৃত্যু শরৎচন্দ্রকে আঘাত করেছিল। তিনি তা নিয়ে একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন এ মৃত্যু আর্টের মৃত্যু। কিন্তু কিরণময়ীর মস্তিষ্ক বিকৃতির ঘটনা কি আর্টের দিক থেকে খুব সমর্থনযোগ্য? কিরণময়ী চরিত্রের বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু তার পরিণতির আকস্মিকতা নিয়েও প্রশ্ন না উঠে পারে না। নারী জীবনের প্রেম, যাকে শরৎচন্দ্র মনে করতেন পরম সম্পদ তার বিজয় পতাকা উড়িয়েছেন তিনি। পাছে নারী চরিত্রে কলঙ্কের স্পর্শ লাগে, তাই পঙ্ক সম্ভবা হলেও তাকে শরৎচন্দ্র পঙ্কজের মত সুন্দর করে তুলেছেন। পিয়ারী বাইজী, চন্দ্রমুখী, সাবিত্রী তার প্রমাণ। এদের ক্ষেত্রে সমাজ থেকে কোন বাধা আসেনি। শরৎচন্দ্রকেও ভিন্ন জাতীয় পরিণতির চেহারা আঁকার জন্য কৈফিয়ত দিতে হয় নি। সমস্যা উঠতে পারত 'শেষ প্রশ্নে'র ও 'গৃহদাহে'র অচলাকে নিয়ে। শেষ প্রশ্নের মত তর্ক কণ্টকিত উপন্যাসে একাধিক পুরুষের প্রতি কমলের আসক্তি তার প্রেমবস্তুটির অস্থিরতা বিষয়ে পাঠককে সচেতন করে তোলে। কিন্তু কমল ঠিক অতি পরিচিত সমাজের নারী নয়। সে মূর্তিমতি বিদ্রোহিনী। তার আচরণ যতটা না নারীসোভন, তার চেয়ে অনেক বেশী বিদ্রোহাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তব উদাহরণ। 'দত্তা'র বিজয়াও শিক্ষিতা ছিল, কিন্তু কমলের শিক্ষা তার যুক্তিপ্রবণ মনকে এমনভাবে পরিচালিত করেছে যাতে তার কথা ও আচরণকে মনে হয় ঠিকই সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। আর 'অচলা' ব্রাহ্ম। অতএব স্বামী মহিম ও স্বামীর বন্ধু সুরেশকে অবলম্বন করে তার চিত্তের দোদুল্যমানতা আমাদের হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী স্বাভাবিক নয়। কিন্তু অচলার পরিণাম প্রথালোকিত সমাজ মনে শরৎচন্দ্রের অন্যান্য নারীর ট্রাজেডি থেকে পৃথক ছিল না। অচলার করুণ অবস্থা অনেকটাই পরিস্থিতি ও অর্থনীতি ঘটিত। ব্রাহ্ম বলে সে হয়ত হিন্দু নারীদের চেয়ে বেশী সংস্কার মুক্ত ছিল। কিন্তু সেই মুক্তির কোন অর্থই নেই যদি না তা অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। অর্থনীতির

দিক থেকে রমা স্বাধীন ছিল। কিন্তু সেখানে তাকে বেঁধেছিল সমাজ-নীতি। সামাজিক রীতি-নীতির ব্যাপারে বন্ধনমুক্ত ছিল না শরৎচন্দ্রের কোন নারীই। বস্তুতঃ হিন্দুনারীর সনাতন প্রেম-ভক্তিই শরৎচন্দ্রের হাতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রেম মৃত্যুঞ্জয়, প্রেম স্থানকালোত্তীর্ণ প্রভৃতি তত্ত্ব কথাই রূপ নিয়েছে তাঁর উপন্যাসে। 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের কুমারী সন্ধ্যার অতুলের প্রতি প্রেম, 'দেনা-পাওনা'' উপন্যাসে লম্পট স্বামীর প্রতি ষোড়শীর প্রেম, দ্বৈধ-নির্মলের দাম্পত্য প্রেম···ইত্যাদি। প্রেমকে নানা পরিবেশে দেখিয়ে তাকে চূড়ান্ত জীবনসত্যের রূপ দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। তবু প্রশ্ন জাগে, রোহিণীর পরিণতির বিরুদ্ধে যে শরৎচন্দ্রের অত অভিযোগ ছিল, তিনি রমা বা কিরণময়ীর এমন কোন পরিণতি দেখাতে পেরেছিলেন কি যেখানে সামাজিক covention প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে? নিশ্চয়ই না। তাঁর কোন উপন্যাসেই শেষ পর্যন্ত convention-কে টলাতে পারেন নি তিনি। তবে যেহেতু সমগ্র জীবন ধ'রে মানুষের জীবনকে নানাভাবে দেখার সুযোগ মিলেছিল তাঁর, সুতরাং critical realist-দের মত সেই জীবনকে রূপায়িত করার কোন বাধা হয়নি তাঁর। কিন্তু রুশ সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র ধনতন্ত্র শাসিত গ্রামীন সমাজ জীবনের বাস্তব রূপকার মাত্র। তাঁর কোন উপন্যাসই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গী নয় ('পথের দাবী' মনে রেখেই বলছি)। 'Social reform or construction আমার কাজ নয়। আমার ব্যবসা লেখা।'—শিল্পীর জবানবন্দী হিসেবে যত সত্যই হোক কথাটা, প্রত্যক্ষ দায়িত্ব না থাকলেও Social reform-এর মহান দায়িত্ব শিল্পীরা পরোক্ষে পালন করেছেন অনেক সময় তা একেবারে মিথ্যে নয়। 'Sorrows of weather', 'Justice' অথবা 'Mother'-এর সামাজিক ভূমিকা কি ভুলে যাওয়ার? সে ভূমিকা শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসই গ্রহণ করতে পারে নি। পারলে তাঁর সাহিত্য অন্ততঃ 'পঙ্গু' হত না।

বৃত্ত

জ্যোৎস্নাময় বস্ত্র

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তাড়াহুড়া করে চলে এসেছি বিমান বন্দরে। এসে খবর নিয়ে জানলাম সব বিমানই দেরীতে আসবে এবং ছাড়বে। শীতের সকালে কুয়াশার জন্যই এ বিভ্রাট। আমি এসেছি আমার কোম্পানীর চেয়ারম্যানকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। তিনি দিল্লী থেকে আসছেন। এখানে নামবার কথা আটটা পনের মিনিটে। চেয়ারম্যান বলে কথা। আমি আটটার মধ্যেই বিমান বন্দরে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

খবর নিয়ে জানলাম বেলা দশটার আগে দিল্লীর ফ্লাইট নম্বর আই. সি. ৪০১ এর পৌঁছবার কোন সম্ভাবনা নেই। অন্ততঃ দু'ঘন্টা আমাকে বসতে হবে। এই দু'ঘন্টা সময় কাটান একটা সমস্যা বটে। বিমান বন্দর ঘুরে ঘুরে দেখবার প্রশ্ন নেই। কারণ আমাকে প্রায়ই আসতে হয় এখানে বড় কর্তাদের আসা এবং যাওয়ার তদারক করতে। নিজেরাই নিজেদের তদারক করতে পারা হয়ত উচিত কিন্তু সেটা আমাদের দেশে শোভন নয়। বড় বড় কর্তা ব্যক্তি সব। সঙ্গে অন্ততঃ একজন মোসাহেব না থাকলে নিজেরা যে সাহেব সেটা বোধ হয় প্রতিপন্ন হয় না।

তাদের হাতে একটা সুদৃশ্য হাতব্যাগ থাকে। বড় কর্তাদের হাতব্যাগ নিয়ে চলাটা চালু হয়েছে দেশ স্বাধীন হবার বেশ কয়েক বছর পরে। অনেকটা মেয়েদের ভ্যানিটী ব্যাগ নিয়ে চলার মত।

এইসব হাতব্যাগের ওজন—হাঁ তা প্রায় কেজীখানেক তো হবেই, একটু বেশীও হতে পারে। সেই কেজীখানেক ওজনের ব্যাগটা অন্য একজন বহন করে পেছনে পেছনে চললে তবেই না মর্যাদা। বড় কর্তাদের এই মর্য্যাদা পাওয়ার অধিকার জন্মেছে। কর্তা কথাটা লিখলাম বটে কিন্তু মুখে কখনও বলিনা। মুখে বলি বড় সাহেব। এও নাকি সম্মানের ব্যাপার। বড়কর্তা বা বড়বাবু বললে সম্মানের হানি হয়। নাম ধরে বাবু বললে বা মিষ্টার বলে সম্বোধন করলে সেখানেই চাকরী খতম।

কাজেই আমাকে প্রায়শই দেখা যাবে বিমান বন্দরে বড় কর্তাদের পেছনে ব্যাগহাতে এবং 'ইএস স্যার,' 'ইএস স্যার' করতে। অনেক সময় কি বলছেন অত বুঝিনা বা বুঝবার প্রয়োজনও মনে করি না কিন্তু 'ইএস স্যার' বলে যাই। এই 'ইএস স্যার' বলার মধ্যে অনেক কেরামতি আছে। সময়মত এবং কায়দা করে 'ইএস স্যার' বলতে হয়। 'ইএস' এর 'এ'র ওপর মেপে জোর দিয়ে স্পষ্ট করে 'স্যার' উচ্চারণ করতে হয়। পোষাকেও অনেক সেজা রাখতে হয়। বড় কর্তাদের মোসাহেবকেও একেক জন সাহেব সাজা দরকার। নিচু মহলের অনেকেই তো ব্যাগ বহন করে এবং 'ইএস' 'স্যার'। বলে কিন্তু তাতে তো আর বড়কর্তা প্রতিপন্ন হয় না। দস্তর মতো চলনে বলনে সাহেব সাহেব একজন মোসাহেব হলে তবেই না মর্যাদা।

আমার অবশ্য এতে লোকসান নেই। কারণ মোসাহেব হলেও পালতরা একটা পদ এবং ভাল অঙ্কের মাইনে পাওয়া যাচ্ছে। ফ্যাসান দুরস্ত পোষাক পরা, কায়দা করে হাটা এবং ততোধিক কায়দা করে 'ইএস স্যার' বলতে শিখেই আমি আজ করে খাচ্ছি।

এই দু'ঘণ্টা সময় কাটাবার সমস্যা মেটাতে বইএর দোকানে ঢুকে একটা বই কিনে ফেললাম। বাংলা বই, সুদৃশ্য মলাট এবং দামে সস্তা। আগে কোনদিন বাংলা বই হাতে রাস্তায় বেরোতাম না। ইংরাজী বই হাতে থাকাটা ফ্যাসান ছিল। আজকাল বাংলা বই হাতে রাখাও ফ্যাসান হয়েছে। ভালই হয়েছে। বিমানবন্দরেও বাংলা বই পাওয়া যাচ্ছে।

সময় কাটাবার জন্য বইটা কিনে দেখেশুনে একটা কৌচে বসে বইটা পড়ছি আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে এপাশ ওপাশ দেখছি। এপাশ ওপাশ দেখছি মানে কোন সুন্দরী মেয়ে সেখান দিয়ে গেলে তাকে দেখি। সুন্দরীদের আমি আজকাল আর আগের মত করে দেখিনা। মুখের দিকে বেশী তাকাই না, একটু দেখি। আগে আগে মুখই দেখতাম বেশী, তারপরই নজর পড়ত বুকের দিকে।

আজকাল মুখটা দেখি পছন্দ করার জন্য। যার মুখ পছন্দ হয় না তার পেছন দিকটাতেও নজর দিই। আজকাল পিঠ আর পাছা দেখতেই পছন্দ করি। সুগঠিত কাঁধ সমেত পিঠের সঙ্গে যদি কেউ সুমিতভাষিণী হয়

তাহলে আমার দেখতে খুব ভাল লাগে। তেমন নির্জনতম্বিনী রাস্তাঘাটে দেখতে পেলে আমি তার পেছন পেছন মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারি। মাঝে মাঝে অনেক সময় আমার তাই অকারণেই হাঁটা হয়ে যায়। মাইলের পর মাইল অবশ্য কোনদিনই হাঁটতে হয় নি; কারণ যাদের পেছনে হাঁটি তারা বড়জোর এক ফার্লং হাঁটেন। এই রকম হাঁটাতে কোনদিন বিপদেও পড়তে হয়নি। হবার কথাও নয়। নয়নভরে এই সচল সৌন্দর্য্য দেখতে হলে একটু নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হয়।

বিমানবন্দরে তাই বসে বসে বই পড়ছিলাম আর বারবারই মুখ তুলে হতাশ হচ্ছিলাম। আমার কাছেই একজন মহিলা বসেছিলেন যার মুখটা পছন্দ হয়েছে। আমার কাছেই মহিলা বসেছিলেন বললাম বটে কিন্তু ঘটনাটা তা নয়। আমিই তার কাছাকাছি দেখে শুনে একটা বেঞ্চি পছন্দ করে নিয়েছিলাম। এখানেও হতাশ হতে হচ্ছে। মহিলা বসে আছেন তো বসেই আছেন। উঠবার আর নাম নেই।

আমি বসে বসে বই পড়ছি আর চোখের কোণে মহিলার উপর নজর রাখছি। একবার উঠলেই হয়। কিন্তু সে গুড়ে বালি। মাঝে মাঝে মুখ তুলেও দেখছি। এও আজকাল আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। এতে গল্পের খেই আজকাল আর হারিয়ে যায় না।

বইটা কয়েক পৃষ্ঠাতেই বেশ জমে উঠেছে। এক ভদ্রলোক—আমার মতই হবেন তিনি বেড়াতে গেছেন। একটা হোটেলে উঠেছেন। তিনিও প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় খাবার ঘরে একজন মহিলাকে দেখতে পান। মহিলা তার দশ এগার বছরের ছেলেকে নিয়ে উঠেছেন সেই হোটেলে। মহিলাকে ভদ্রলোকের পছন্দ হয়েছে। তার সুগঠিত দেহটা দেখে ভদ্রলোক সুযোগ খুঁজছেন।

প্রথমে ছেলের সঙ্গে ভাব জমালেন। এবং সেই সূত্রে কায়দা করে তার মার অনেক প্রয়োজনীয় খবর জেনে নিলেন। জানলেন তার মার সঙ্গে বাবার বিশেষ বনিবনা নেই। সুযোগ মত ছেলের কাছে তার মার প্রশংসাও করলেন বেশ ঘটা করে। ছেলে গিয়ে তার মাকে সে সব কথা বলবে এ সম্বন্ধে ভদ্রলোক নিশ্চিত।

ছেলের সূত্রে মার সঙ্গে আলাপ হল। পরিচয় হবার পর একসঙ্গে

বেড়াতেও বেরোলেন। নানান রকম গল্প হল। এই বেড়াতে যাওয়াতে ছেলেরই বেশী উৎসাহ। ওরই মধ্যে ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপটা অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং কাঁকমত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেও থাকছেন। ছেলেও বেশ খুশী। সেও তাদের সঙ্গে আঠার মত লেগে রয়েছে। কিন্তু ভদ্রলোকের কাছে ছেলের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তার মার সঙ্গে তখন বেশ ভালরকমই জমে উঠেছে। ভদ্রলোক বুঝতে পেরেছেন মহিলাকে কাছে পেতে কোন অসুবিধাই হবে না। একমাত্র সমস্যা হল ছেলেটিকে নিয়ে। ছেলে ভদ্রলোকের এত ভক্ত হয়ে পড়েছে যে ছেলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে তার মাকে পাওয়াই যাচ্ছে না। এই সমস্যা নিয়ে ভদ্রলোক এবং মহিলা দুজনেই বিব্রত। মাঝে মাঝে মহিলা ছেলের সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করে ফেলছেন।

এমন সময় বিমান বন্দরে "আমার মাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে" বলে দু'তিনবার একটা চিৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু হৈ চৈ শুরু হল। ঘাড় ফিরিয়েই সঞ্জয়কে দেখতে পেলাম। আমি উঠলাম না সেখানেই বসে রইলাম। সঞ্জয়ের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের খণ্ড যুদ্ধও হয়ে গেল। মুহূর্তেই ভীড় জমে গেল। সঞ্জয় মার খেল, লাঞ্ছিত হল। আমি বসেই রইলাম।

এ ঘটনা বছর দশেক আগে ঘটলে সঞ্জয়ের লাঞ্ছনাকারীর দল পালাবার পথ পেত না। আমার একটা ঘুষির স্বাদ পেলে কেউ আর দ্বিতীয় ঘুষির জন্য অপেক্ষা করত না। কেউ করেওনি কোন দিন। তখন আমি এরকম কেতাদুরস্ত ছিলাম না।

আমার একটা ছোটখাট দল ছিল তখন। খেলাধূলা, থিয়েটার, পূজা, বন্যাত্রাণ, দুষ্টের দমন ইত্যাদি সবকাজ আমরা করতাম। আমিই ছিলাম সেই দলের মধ্যমণি। তখনকার দিনের 'মস্তান' হতে হলে গায়ের জোর সাহস ইত্যাদি গুণের সঙ্গে লেখাপড়ায়ও ভাল হতে হত। মাঝে মাঝে এই জন্য নানান মুস্কিলেও পড়তে হত। এই রকম দল প্রায় প্রতিপাড়াতেই ছিল এবং তাদের মধ্যে রেশারেশি ও শত্রুতার ভাবও থাকত।

মনে পড়ে একবার আমি বেকায়দায় পড়েছিলাম। আমার শত্রুদলের জনা চারেক সুবিধামত আমাকে একলা পেয়েছিল। এমন জায়গায় তারা

আমাকে পায় যে আমার চেলা চামুণ্ডাদের তার ধারে কাছে কোথাও পাবার সম্ভাবনা নেই।

আমি ওদের আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখেই বুঝেছিলাম যে আমার নিস্তার পাওয়া শক্ত। হয়ত দৌড়ে পালিয়ে আমার এলাকায় চলে আসতে পারতাম কিন্তু দৌড়ে পালাতে আমার ইজ্জতে বাধল। এক মুহূর্তে নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। ওদের দিকে মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে একজনের মুখে বিরাশী সিক্কার একটা ঘুসি লাগিয়ে, মাথা নিচু করে অন্যদের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে দ্বিতীয় জনের পেটে দিলাম কনুই দিয়ে এক গুঁতো। তারপর একটু তাকিয়ে দেখি ঘুষির চোটে একজনের ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে আর পেটে হাত দিয়ে দ্বিতীয়জন কাতরাচ্ছে। তখনই আবার হুঙ্কার ছেড়ে তৃতীয় জনের দিকে ঘুষি বাগাতেই সে দৌড় লাগাল আমার এলাকার দিকে। আমিও তার পেছন পেছন দৌড়ে আমার এলাকার কাছাকাছি চলে এলাম। সে একটা গলিতে ঢুকে গেল। আমি একটু দাঁড়িয়ে আবার আমার পেছনে লাগতে এলে আরও বেশী শাস্তি দেবার হুমকি দিয়ে চলে এসেছিলাম।

আরও একটা ঘটনার কথা এখানে মনে পড়ে। আমাদের পাড়ায় পুলিশের উঁচুদরের একজন অফিসার থাকতেন। তার বড় ছেলে সুধীর আমার থেকে দু এক বছরের বড় ছিল। সে মাঝে মাঝে নানারকম দৌরাত্ম্য করত। পুলিশ অফিসারের ছেলে বলে কেউ কিছু বলতে সাহস পেত না। আমাদের পাড়াতেই একটি মেয়ের পেছনে লেগেছিল। মেয়েটিকে একদিন একলা পেয়ে হাতধরে টেনেছিল এবং কুপ্রস্তাব করেছিল। মেয়েটিকে ওর হাত থেকে ছাড়া পেতে বেশ ধস্তাধস্তি করতে হয়েছিল। ব্লাউজও একটু ছিঁড়ে গিয়েছিল। সে অবস্থায় বাড়ী ফিরে তার মাকে সবকথা বলে।

পাড়ায় আমি থাকতে এরকম ঘটনা? মেয়েটির মা আমাকে এভাবেই তাতিয়েছিলেন, তার বাড়ীতে ডেকে। আমি সব কথা শুনে উঠে গিয়েছিলাম। সঙ্গে একজন চেলাকে নিয়ে সেই পুলিশ অফিসারের বাড়ীতে গিয়ে সুধীরকে ডেকে এনে দিয়েছিলাম একটা ঘুষি। সুধীর সেখানেই পড়ে গিয়েছিল। সেই মেয়েটিকে অপমান করার জন্যই তাকে শাস্তি দিলাম এবং আবার এরকম ব্যবহার করলে তার দাঁতগুলি খুলে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে এসেছিলাম।

এ ঘটনায় আমাকে পুলিশের ঝামেলা পোহাতে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু পুলিশ অফিসার সুবিধা করতে পারেন নি। আমাদের পাড়াতেই একজন জাঁদরেল উকিল ছিলেন। তিনি বিনা পারিশ্রমিকে আমাদের কেস হাতে নিয়েছিলেন।

বছর দশেক আগেও আমি ওইরকমই ছিলাম। সঞ্জয় ছিল আমার চেলাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং আমার প্রিয়পাত্র। সঞ্জয়ের বাড়ীতে অনেক-বারই গেছি। বাড়ীতে পিঠে পায়েস হলে সঞ্জয় আমাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে যেত। সঞ্জয়ের মাও আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি খুব আমুদে ছিলেন এবং সবসময়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন।

সেই সঞ্জয়ের মা হঠাৎ একদিন হারিয়ে যান। তার বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে আর ফেরেন নি।

সঞ্জয়ের বাবার সেই বন্ধুকেও আমি দেখেছি। মাথায় টাক তার চেহারায় একটা বিশেষত্ব ছিল। প্রায়ই আসতেন তিনি সঞ্জয়দের বাড়ীতে।

এই ঘটনার পর সঞ্জয় কিরকম যেন হয়ে গেল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। বিশেষ কথা বলত না। আমার দলও ছেড়ে দিয়েছিল।

কালক্রমে আমার দলও ভেঙ্গে গেল। সাংসারিক প্রয়োজনে 'মস্তানী' করবার অবকাশ পাওয়া যেত না। আমি তখন লেখাপড়া সাঙ্গ করে জীবিকান্বেষণে বেরিয়েছি। লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম বলে চাকুরীও জুটে গিয়েছিল।

নানা ঘাটের জল খেয়ে খেয়ে এই মোসাহেবের চাকুরীতে থিতু হয়েছি। বিয়ে করে নিজের সংসারও গুছিয়ে নিয়েছি এই মোসাহেবী করে। আমার দল, আমার 'মাস্তানী' সব ভুলে গেছি। সঞ্জয়ের কথাও মনে নেই। সে পাড়া ছেড়ে একটী মাঝারী সাহেব পাড়াতে উঠে গেছি অনেকদিন। আমার ছাত্রাবস্থার ঘটনাবহুল জীবনের খবর এখন আর কেউ রাখে না। আমিও ভুলে গেছি।

'আমার মাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে' বলে চিৎকার শুনেই ঘাড় ফিরিয়ে সঞ্জয়কে চিনতে পারলাম। সঞ্জয়ের সামনে একজন বয়স্ক টেকো ভদ্রলোক এবং তারও আগে একজন মহিলা—তিনিও বয়স্কা। টেকো ভদ্রলোকের স্ত্রীই হবেন। এ টেকো ভদ্রলোককে লক্ষ্য করেই সঞ্জয় বার কয়েক 'আমার মাকে নিয়ে

পালিয়ে যাচ্ছে' বলে চিৎকার করতে ভদ্রলোক ঘুরে দাড়িয়ে সঞ্জয়কে দিলেন এক গলাধাক্কা। সঞ্জয় পড়তে পড়তে একটা কৌচ ধরে নিজেকে সামলে নিল। ভদ্রলোক তখন হিন্দীতে অন্যান্যদের বললেন যে সঞ্জয় তার লোক নয়, তিনি তাকে চেনেনও না। সঞ্জয় টাল সামলে উঠে আবার চিৎকার শুরু করতেই ভদ্রলোক আবার তাকে ঘাড় ধরে গেটের বাইরে বের করে দিলেন।

সঞ্জয় কি দুর্বলই না হয়েছে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। সেই টেকো ভদ্রলোক অনায়াসে গলাধাক্কা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছেন।

আমি আমার কৌচেই বসে রইলাম। একটু নড়েচড়েও বসলাম না। সেখানে বেশ ভীড় জমে গেল। সঞ্জয় আবার চিৎকার করতে করতে ছুটে এসে সেই ভদ্রলোককে হাত পা ছুড়ে আক্রমণ করল। কি আনাড়ীর মতই না হাত পা ছুড়তে লাগল এবার সেই টেকো ভদ্রলোককে বিশেষ কিছুই করতে হল না। উৎসাহী দর্শকরা নির্মমভাবে সঞ্জয়কে মারতে শুরু করল। আমি বসেই রইলাম। বিমান বন্দরে এই বিসদৃশ ঘটনা এই প্রথম ঘটতে দেখলাম।

সঞ্জয় মার খেয়েও উঠে আবার 'আমার মাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে' বলে চেঁচাতে শুরু করল। এবার কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়, টেকো ভদ্রলোককে তো নয়ই। বোধহয় নিজেকে উদ্দেশ্য করেই বলতে লাগল। তারপরই 'আমার মা' 'আমার মা' বলে গলা ছেড়ে চিৎকার করে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। বিমান বন্দরের অনেক কর্মচারী তখন সঞ্জয়কে সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছেন। আমি সেই টেকো ভদ্রলোক এবং তার সঙ্গী মহিলার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম দুজনেই দক্ষিণ ভারতীয়।

বিমান বন্দরের এই বিসদৃশ ঘটনা আমার মনে কোন রেখাপাতই করল না। আমি বসেই রইলাম আর মনে মনে ছক কাটতে লাগলাম কিভাবে 'আগমন' দরজা দিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারম্যানের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করব আর কি কায়দায় 'ইএস স্যর' বলব।

বেচারা/আলবার্তো মোরাভিয়া

অনুবাদ : প্রবীর সাহা

কোনজন তার চেয়ে কতটা উৎকৃষ্ট বা কে তার চেয়ে কতটা নিকৃষ্ট এসম্বন্ধে প্রত্যেকে কতটুকু ভাবে আমি জানিনা, কিন্তু আমার নিজেকে সকলের চেয়ে খুবই নিকৃষ্ট বলে মনে হয়। সত্যি কথা বলতে কি লোহার মতো দৃঢ় শরীর কিংবা মাটির পাত্রের মত শক্ত চেহারা নিয়ে আমি জন্মাইনি। বরং আমি নিজের দিকে তাকাই আর ভাবি, যে আমি কাচের মত ভঙ্গুর—সবচেয়ে পাতলা কাচের মত ভঙ্গুর শরীর নিয়ে আমি জন্মেছি। হয়তো এটা একটু বেশীই নিজেকে ছোট ক'রে ফেলা হ'লো—

আচ্ছা আমরা গুণগুলি সম্বন্ধে নাহয় একটু ভেবে দেখা যাক। শারীরিক শক্তি? মোটেই নেই। ছোটখাট দুমড়ানো রিকেটি চেহারার আমি একটি প্রাণী যার হাত পা গুলি সরু কাঠির মত। বুদ্ধি?—একটা মাকড়সার মত—নাকি তার চেয়ে একটু বেশী? আমি যে কোন কাজের ব্যাপারে দেখেছি মোটেই আয়ত্ত করতে পারিনা। হোটেলে ডিশ ধোয়ার কাজ ছাড়া আর কিছুই আমার দ্বারা হ'য়ে ওঠে না। আচ্ছা—দৃষ্টিভঙ্গী তারও কোন বিশেষত্ব নেই। লম্বা ধূসর রঙের মুখ, নোংরা চোখ—যা অসালীন বলেই মনে হয়, আর মনে হয়, আর নাকটা, যেটা মুখের মাপসই না হ'য়ে হ'য়েছে বিশুণ, বেশ মোটাসোটা আর লম্বা। মনে হয় নাকটা যেন সোজা নীচের দিকে নেমে যাবে। যেন জলহস্তীর খাঁড়াটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর সব গুণ—যেমন সাহসিকতা, চটপটে ভাব, সৌন্দর্যবোধ, সুস্থ অনুভূতি এসব কিছু সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

নিজের বাস্তব আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে এমন নিখুঁত ধারণা হওয়ার পর আমি কখনও মেয়েদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিনি। একবার মাত্র একজনের দিকে একটু এগিয়েছিলাম—সে ছিল হোটেলের পরিচারিকা—সে আমাকে 'হায় বেচারা পুঁটিমাছ' বলে একেবারে ধুলোয় বসিয়ে দিয়েছিল।

তারপর থেকে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হলাম, যে আমার কোন মূল্যই নেই। সুতরাং সবচেয়ে ভাল কাজ হচ্ছে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকা, আর সঙ্গীটঙ্গী না খোঁজা।

যদি কোনদিন এই 'রোম' হোটেলের পেছনের রাস্তা দিয়ে যান, দেখবেন একসার খোলা জানালা—বিকেলের শুরুতেই সেখান থেকে বাসন ধোয়ার দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। যদি ভেতরে একটু দৃষ্টি ফেলেন তাহলে দেখবেন থাকের পর থাক ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে ডিশের সারি। এটাই আমার নিজস্ব জায়গা। এখানে কেউ আমায় সহজে দেখতেই পাবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য, কে ভাবতে পেরেছিল ঐখান থেকে ঐ রান্নাঘরের পাশের কোটর থেকে আমাকে কেউ খুঁজে বার করবে, এমন ভাবে যেমন কেউ আশ্চর্য হয়ে তুলে নেয় ঘাসের বুকে গোপনে থাকা ফুলকে!

গ্যিভিটা আর আমি এই বাসন ধোয়ার কাজ করতাম। সে প্রসবকালীন ছুটিতে গেলে তার বদলী বহাল হ'লো ইভা নামে এই মেয়েটি। ইভা ঠিক আমার মতই সাধারণ। আমার মতই হতভাগ্য, ছোটখাট দুমড়ানো মাংসহীন অস্থিচর্মসার। ওর সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী আর কিছু উল্লেখ করার নেই। কিন্তু এটুকু বলতেই হবে যে ও খুব কর্মঠ চটপটে আর—আর খুব আবেগপ্রবণ। সব সময় আনন্দে টগ্‌বগ করছে। একের নম্বরের বিচ্ছু স্বভাব!

আমরা খুব শীঘ্রই পরস্পরের বন্ধু হ'য়ে পড়লাম। এর একটা কারণ অবশ্য আমরা মুখোমুখি কাজ করি। একই ডিসগুলির দুদিকে—একই তেলতেলে জলে এবং তারপর এক বস্তু থেকে আরেক—আমরা পরস্পরের খুব কাছে এসে পড়লাম।

কোন এক রবিবারে সে আমাকে সিনেমা যাবার কথা বলল, আর আমি তাকে সিনেমায় নিয়ে গেলাম। অন্ধকার সিনেমাহলে আমি তার আচরণে খুবই আশ্চর্য হলাম। সে তার হাতে আমার পাঁচটা আঙুল জড়িয়ে বসে রইল। আমি বোকামী মনে করে হাত সরিয়ে নিতে চাইলাম, কিন্তু সে ফিসফিস করে আমাকে নিরস্ত হ'তে অনুরোধ জানাল। হাত ধরায় বিশেষ কি আর হ'তে পারে; বাইরে আসার পর সে যা বলল তাতে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। সে বলল বেশ কিছুদিন ধ'রে সে আমায় লক্ষ্য করছিল। যেদিন

প্রথম সে হোটেলে চাকরি পেল সেদিন থেকেই। সেদিন থেকে সে আমার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবেনি। এখন সে ভাবতে আরম্ভ করেছে সে আমার জন্য পাগল, কারণ আমাকে ছেড়ে থাকার কথা সে আর ভাবতেই পারে না।

এই প্রথম আমার জীবনে একটি মেয়ে যে আমাকে এই ধরণের কথা শোনাল। আমার মাথা সেদিন থেকে ঘুরে গেল। আমি তার সব কথার জবাব দিতে খুবই উৎসাহী হ'লাম।

কিন্তু আমি খুব আশ্চর্য হ'ই কেমন করে ইভা আমায় ভালবাসল। যদিও সে বারবার আবৃত্তি ক'রে গেছে যে সে আমার জন্য পাগল, কিন্তু আমি সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনি। সুতরাং যখনই একসঙ্গে বেড়িয়েছি একই প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞাসা না ক'রে পারিনি। বারবার ঐ কথা শুনতে লোভ হ'য়েছে।

—'আচ্ছা, আমার মধ্যে তুমি কি দেখেছ? তুমি ভালবাসলে কি ক'রে? বিশ্বাস করবেন না ইভা দু'হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে তার চোখদুটি উজ্জ্বল করে বলেছে—'তোমায় ভালবাসি কারণ তুমি গুণবান, তুমি সবদিক থেকে সম্পূর্ণ একটা মানুষ যে ঠিক ঠিক বেঁচে আছে।' হতভম্ব হ'য়ে আমি আবার বলি—'আমার মধ্যে সব ভাল গুণ আছে? আমিতো কখন তা বুঝতে পারিনি!' 'হ্যাঁ সব, স-ব। আর তুমি দেখতেও খুব সুন্দর।' আমি না হেসে থাকতে পারিনি, আমি বলেছি, 'আমায় দেখতে সুন্দর? তুমি কখনও আমার মুখের দিকে তাকিয়েছ?'

—'হ্যাঁ দেখেছি', ইভা বলেছে, 'সারাক্ষণইতো দেখছি।'

—'আমার নাকটা কখনও দেখেছ?'

—'এটা এমন এক ধরণের নাক যা আমার ভাল লাগে', সে বলেছিল। তারপর আমার নাকটা দু আঙুলে ধরে ঘন্টার মতো নেড়ে বিহ্বল গলায় বলল 'নাক, আমার নাক!' সে বলল, 'এই নাক নিয়ে আমি যে কি করি ভাবতেই পারছিনা' তারপর একটু থেমে বলল, 'তুমি খুব বুদ্ধিমান!'

—'আমি বুদ্ধিমান?' আমি বললাম, 'সবাই তো আমাকে মূর্খ বলেই মনে করে।'

—'লোভক হিংসায় বলে!' সে নারীসুলভ ঝঙ্কার দিলো, 'তুমি বুদ্ধিমান,

সকলের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান, যখন তুমি কথা বলো আমি হাঁ ক'রে তোমার কথা শুনি। এতো লোকের সঙ্গে মিশেছি কিন্তু তোমার মতো বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ আমি দেখিনি।

—'ঠিক আছে', কোন রকমে সামলে বলি, 'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে শক্তিমান ভাবোনা ?

সে ভাবালু কণ্ঠে বলে চলল, 'হাঁ। তুমি খুব বলবান, খুব খু-উ-ব বলবান।'

এই কথাটা গলাধঃকরণ করতে আমার বেশ সময় লাগল, ফলে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম। আবার সে শুরু করল, 'তাছাড়া তুমি যদি বেশী কিছু জানতে চাও, আমি বলব আমি তোমায় ভালবাসি।'

—'বেশী কিছু বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—'কি ক'রে বোঝাতে হয় আমার তা জানা নেই, তবু বলতে পারি তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার কথা বলার ভঙ্গী, যেভাবে তুমি চলাফেরা করো··· নিশ্চিত যে তোমার যা আছে অন্যের তা নেই।'

প্রকৃতপক্ষে আমি কথাগুলো বিশ্বাস করিনি। তাই বারবার কথাগুলি ওকে দিয়ে পুনরাবৃত্তি করিয়েছি। শুধুমাত্র আমি নিজেকে যা ভাবি তার সঙ্গে তুলনা করার জন্যই। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ক্রমশঃ আমি কথাগুলি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলাম। মাঝে মাঝে ভাবি ধরা যাক কথাগুলি ঠিক। কিন্তু এতদিন আমি যা ভেবেছি তার থেকে আমি সত্যিই আলাদা প্রকৃতির এটা কি ঠিক ? কিন্তু ইতার অনুভব 'কিছু' আমায় দোটানায় ফেলে দিলো। বারবার আমার মনে হ'তে লাগল মন্তব্যগুলির মধ্যে কিছু রহস্য আছে।

আমার তো মনে হয় বিশেষ কিছু' বলতে মেয়েরা শক্তিশালী, বেঁটে, বা বৃদ্ধ, কিংবা দৈত্যদেরও বোঝাতে পারে। কিন্তু 'বিশেষ কিছু' বলতে আমায় বোঝাবে কেন ? আমিতো শক্তিশালী, বেঁটে, বৃদ্ধ, কিংবা দৈত্যও নই।

একদিন আমরা ঠিক করলাম সার্কাস দেখতে যাবো। সার্কাস কোম্পানী Passeggiata Archeologica'র সামনে তাঁবু সাজিয়েছে। আমাদের দু'জনের বেশ ভালই লাগছিল। বিশাল তাঁবুর মধ্যে আমরা সস্তার সীটে

বসেছিলাম, হাতে হাত রেখে ঘন হ'য়ে। আমার ঠিক পেছনে বসেছিলেন একজন দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী যুবতী, এবং তার পাশে লম্বাচওড়া স্বাস্থ্যবান খেলোয়াড় সুলভ চেহারার এক যুবক। তাদের বেশ মনোরম জুটি বলেই মনে হচ্ছিল। অবশ্যই তাদের দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিলাম। মন দিয়ে সার্কাস দেখতে লাগলাম। মাঝখানের খেলা দেখানোর জায়গাটা হলুদ রঙের বালি ছড়ানো, সেখানটা তখনও খালি। একদম শেষ প্রান্তে উঁচু জায়গায় লাল পোষাক পরা ব্যাণ্ডবাদকের দল। পেতলের বাদ্যযন্ত্র এবং ফ্লুট থেকে যেন যুদ্ধের বাজনা দ্রিম দ্রিম তালে বাজছিল।

দু'জন বেঁটে আর দুজন লম্বা—চারজন ক্লাউন, সাদা মুখ, ঢিলেঢালা পাজামা পরা মাঝখানে এসে দাঁড়াল। তারা কাগজ কাটল, নানা রকম হাসিঠাট্টা করল, পরস্পরকে চাপড় মেরে লাথি মেরে চলল, দেখতে দেখতে ইভা হাসতে লাগল, হাসতে হাসতে কাশি এসে গেল। ঠিক তখন বাজনাগুলো খুব জোরে বেজে উঠল, একসঙ্গে ছ'টা ঘোড়া—তিনটে ঘন ছাইরঙের আর তিনটে সাদা, মাঝখানের ঘেরা জায়গায় প্রবেশ করল তারপর গোল হ'য়ে ঘুরতে লাগল। লাল আর সোনালী পোষাকপরা 'ট্রেনার' ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে। সে মাঝে মাঝে চাবুক হাঁকাচ্ছিল। সাদা কাঁচুলী আর আঁটসাঁট ঘাঘরা পরা একটি মেয়ে নাচতে নাচতে এসে একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে পাশে পাশে ছুটতে লাগল। সে মাঝে মাঝে এক একটি ঘোড়ার পিঠে চাপছিল আবার পরক্ষণেই নেমে পড়ছিল। ঘোড়াগুলো ঘুরছে তো ঘুরছেই, প্রথমে ছোটছোট কদমে শেষে লাফিয়ে লাফিয়ে।

ঘোড়াগুলো চলে গেল। তখন ক্লাউনেরা ভিগবাজী খেয়ে পরস্পরের পেছনে লাথি মেরে চলে গেল। ট্রাপিজের খেলা শুরু। বাবা মা ও ছেলে। তিনজনই নীল রঙের আঁটসাঁট পোষাক পরেছে। তিনজনই খুব স্বাস্থ্যবান। বিশেষ ক'রে ছেলেটি। তারা হাততালি দিলো এবং এক এক লাফে দড়ি ধ'রে ওপরে সেই ছাদের কাছে উঠে গেল। ট্রাপিজগুলো উপরে শূন্যে দুলিয়ে নিজেদের কাছে ফিরিয়ে আনল, আবার ছুঁড়ে দিলো। এইভাবে তারা কখনও পা দিয়ে কখনও হাত দিয়ে ঝুলে দুলতে থাকল আর সেই সঙ্গে ছোট ছেলেকে বলের মতো ছুঁড়ে লোফালুফি খেলতে লাগল। মুগ্ধ আমি ইভাকে বললাম—'দেখ, দেখ, যদি আমি একজন ট্রাপিজিষ্ট হতাম, যদি শূন্যে নিজেকে

ছুঁড়ে দিয়ে পা দিয়ে ট্রাপিজ ধরতে পারতাম, ইভা তার স্বভাব অনুযায়ী আরও ঘন হ'য়ে সান্ত্বনার স্বরে বলল, এটা অভ্যাসের ব্যাপার। তুমি যদি অভ্যাস করতে নিশ্চয়ই পারতে।

সেই সুন্দরী মহিলাটি আমাদের দিকে তাকিয়েছিলেন, সঙ্গীর কানে ফিস ফিস ক'রে কি যেন বললেন।

ট্রাপিজের খেলার পরে খুবই মজার খেলা—সিংহের খেলা। লাল টিলে কোট পরে একদল যুবক কার্পেটটি গুটিয়ে ফেলল। তারা গুটিয়ে নেওয়ার সময় খেয়াল করল না যে ঐ কার্পেটের মধ্যে একজন ক্লাউন শুয়ে ছিল। তারা ওকে সুদ্ধ গুটিয়ে ফেলেছিল। ক্লাউনের সাদা মাথাটা বেরিয়েছিল-দেখে ইভা হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল।

খুব যত্নের সঙ্গে ঐ যুবকেরা নিকেল করা বিরাট খাঁচা এনে মাঝখানে বসিয়ে দিলো। খাঁচার মধ্যে সারসার কতগুলি পিপে সাজান। বিরাট কোঁকড়ান কেশরওয়ালা প্রথম সিংহটি ছোট্ট দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো। মোট পাঁচটি সিংহ, এবং তাদের সাথে একটি সিংহী। সিংহীটাকে দেখে মনে হচ্ছিল খুবই বদমেজাজী। সেটা সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করতে শুরু করল। সবশেষে এলেন সিংহের পরিচালক। তিনি এসেই দর্শকদের দিকে মুখ করে ঘুরে ঘুরে অভিবাদন জানালেন। এই মানুষটি বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছোট্ট মানুষ। গায়ে সবুজ কোট, সোনালী জরী লাগান। এক হাতে একটি ঘোড়ায় চড়ার চাবুক, আর এক হাতে একটি হুক লাগান লাঠি—লাঠিটা ঠিক সেই ধরণের যেরকম লাঠি দিয়ে অনেক সময় দোকানে ওপরের জিনিষগুলি নামান হয়।

পরিচালক যখন শান্তভাবে এবং হাসিমুখে দর্শকদের অভিবাদন জানাচ্ছিলেন সিংহগুলি তখন তাঁর চারপাশে গর্জন করছিল। অবশেষে তিনি তাদের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। হুকের খোঁচায় সিংহগুলোকে সারি সারি পিপের ওপর দাঁড়াতে বাধ্য করলেন। হতভাগ্য সিংহগুলো এই সমস্ত ছোট ছোট জায়গায় দাঁড়িয়ে গর্জন করে দাঁত দেখাতে লাগল। পরিচালক যখন তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন দু'তিনটে সিংহ থাবা এগিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু পরিচালক খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যেন লক্ষ্যই করছিলেন না।

—'যদি খেয়ে ফেলে ?' ফিস ফিস করে ইভা আমার হাত জড়িয়ে ধরল।

একসার ড্রাম পড়েছিল। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সিংহটি যেটা প্রায় ঝিমুচ্ছিল আর গর্জন করছিলনা তার হাঁ করা মুখের মধ্যে তিন তিনবার পরিচালক নিজের মাথা ঢোকালেন। চারিদিকে প্রশংসার গুঞ্জরণধ্বনির মধ্যে আমি ইডাকে বললাম, তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি যদি ঐ খাঁচার মধ্যে গিয়ে সিংহের মুখের মধ্যে আমার মাথা ঢোকাতে পারতাম তাহলে কি ভালই না লাগত।

প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আমার দিকে আরও ঘন হ'য়ে বসে ইডা বলল, 'আমি জানি তুমি নিশ্চয় পারবে।'

সুন্দরী মহিলাটি আর তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোক উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলেন। তাঁরা আমার দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে তাকিয়ে ছিলেন।

—'এটা নিছক উড়িয়ে দেবার কথা নয়', ইডা খুব রেগে গেল, 'আমাদের বিদ্রূপ ক'রে হাসছে, ওরা কত রূঢ় ব্যবহার করছেন একথা ওদের বুঝিয়ে দাও।'

কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘন্টা বাজল, প্রত্যেকে উঠে পড়লেন। সিংহগুলো তখন মাথা নীচু করে ছোট্ট দরজা দিয়ে খাঁচায় ঢুকে পড়ছে। খেলার প্রথমার্ধের সমাপ্তি।

তাঁবুর বাইরে ওরা দুজনে আমাদের আগে যাচ্ছিলেন। ইডা একগুঁয়ে মেয়ের মতো বারবার বলতে লাগল, ওদের বলতেই হবে ওরা কতো রূঢ় ব্যবহার করেছেন। যদিনা বলতে পারো তাহলে তুমি একটি কাপুরুষ।

আমি গর্বে ফুলে উঠলাম। ঠিক করলাম ওদের বলতেই হবে। বড় তাঁবুর গায়ে দর্শনী দিয়ে জানোয়ার দেখানোর ব্যবস্থা করেছে, বিভিন্ন খাঁচার মধ্যে বিভিন্ন জানোয়ার, আর খোলা জায়গায় খড়ে ঢাকা মেঝের ওপর শোয়ানো জানোয়ারগুলি ছেড়ে রাখা হ'য়েছে, তাদের মধ্যে জেব্রা, হাতি, ঘোড়া আর কুকুর ছিল। ঐ জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। ভিতরে সেই আধ-আঁধারের মধ্যে দেখতে পেলাম ঐ দুজন ভালুকের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে। সুন্দরী মহিলাটি একটু সামনের দিকে ঝুঁকে ভালুক দেখছিলেন। কোঁকড়ান লোমওয়ালা ভালুকটি গভীর ঘুমে মগ্ন। তার ভয়ঙ্কর পিঠটা আমাদের দিকে। ভদ্রলোক সঙ্গিনীর হাত ধরে টানছিলেন। আমি তার কাছে গিয়ে শক্ত গলায় বললাম—এই যে, আমাদের দেখে বিদ্রূপে হাসছিলেন নাকি?

সে একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত: না করে বলল, 'না আমরা একটা ব্যাঙের দিকে তাকিয়ে হাসছিলাম যে ব্যাঙটি ষাঁড় হবার চেষ্টা করছিল।'

—'ব্যাঙ বলতে মনে হয় আমাকেই বলেছেন?'

—'যদি মনে হয় তাই

ইভা আমার বাহুমূলে ধাক্কা দিয়ে আরও সামনে এগিয়ে দিচ্ছিল।

গলা চড়া করে বললাম, 'তোমাদের স্বরূপ কি জান? তোমরা যাকে বলে এক নম্বরের মুখ্যু, বুড়বাক।'

শাণিত গলায় সে জবাব দিল, 'আঃ, সেই ব্যাঙটা এখন আবার গর্জাচ্ছে দেখ!'

কথাগুলে মহিলাটি হাসতে শুরু করেছিলেন, আর ইভা সাপের ছোবলের মতো গলায় বলে উঠল, হাসবার কিছু নেই, আমার স্বামীর গায়ে তোমার গা ঘসবার চেষ্টা না করাই ভাল, ভেবেছ আমি লক্ষ্য করিনি? তুমি সারাক্ষণ গা ঘসবার চেষ্টা করছিলে।

আমি খুব আশ্চর্য বোধ করলাম। আমি ঠিক খেয়াল করিনি, বোধহয় তার কনুইটা আমার পিঠে বারকয়েক লেগে থাকতে পারে, আমার পিছনে বসেছিল—

—'তুমি একটা পাগল', সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল।

—'না আমি পাগল নই, আমি তোমায় গা ঘসতে দেখেছি।'

—'পুঁটি মাছের মতো চেহারার তোমার ওই স্বামী—আমার দায় পড়েছে' তীক্ষ্ণ তিরস্কারের সঙ্গে জবাব দিল সে, বলল, 'আমার যদি কারও দেহে শরীর ছোঁয়ান'র ইচ্ছা হয় তাহলে একটা প্রকৃত পুরুষ মানুষ পছন্দ করব। এই দেখ একজন প্রকৃত পুরুষ মানুষ'—বলতে বলতে সে তার সঙ্গীর হাতখানা তুলে ধরল, যেমন একজন মাংস বিক্রেতা দাবনার মাংস হাতে ধরে খরিদ্দারদের দেখান।

—'এই বাহু, দেখ, এই সেই বাহু যেখানে আমি শরীর ঘসতে পারি···দেখ পেশীর দিকে···দেখ কী শক্ত!'

লোকটি আমার দিকে এগিয়ে এলো। ভয় দেখিয়ে বলল, যথেষ্ট হয়েছে, ভালয় ভালয় সরে পড়োতো।

আমি উত্তেজনায় চিৎকার ক'রে 'কেন? কেন শুনি?' বলে বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার সমান দেখাবার চেষ্টা করলাম।

এরপর যে দৃশ্য ঘটল তা সারাজীবন মনে থাকবে। সে আমার কথার কোন জবাব দিলো না। হঠাৎ দু'হাতে আমাকে শূন্যে তুলে ফেলল পালকের মতো। খাঁচার উল্টো দিকে খড় বিছানো জায়গায় পোষা জন্তু জানোয়ারগুলি ছাড়া ছিল। ঠিক আমাদের পিছনে সপরিবারে হাতীগুলি—সেই হাতী-পরিবারের বাবা মা আর তাদের শিশু যেটা অপেক্ষাকৃত ছোট—প্রায় ঘোড়ার মতো তারা আধো অন্ধকারে লম্বা কান আর শুঁড় নীচু ক'রে ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়েছিল—দু'হাতে তুলে নিয়ে সে আমাকে ছোট হাতীটার পিঠে বসিয়ে দিলো। জানোয়ারটা চুপ ক'রে কিছুক্ষণ বোধহয় ভাবল যে সার্কাসে খেলা দেখানর সময় হ'য়েছে, সে সার্কাস মঞ্চে যাতায়াতের পথে এদিক ওদিক লাফালাফি করতে লাগল।

ভীড় করা লোকেরা চারিদিকে ছুটোছুটি আরম্ভ করেছে। ইভা আমাদের পিছুপিছু ছুটল। বহু চেষ্টায় আমি দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসলাম। হাতির কান দুটো ধরার জন্য অনেক কসরৎ করলাম, কিন্তু বৃথা। প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে আমি হড়কে মাটিতে পড়ে গেলাম। মাথার পিছনে প্রচণ্ড আঘাত। তারপর আমি আর কিছুই জানিনা।

যখন সুস্থ হলাম দেখি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে শুয়ে আছি। ইভা আমার হাত ধ'রে পাশে বসে আছে। তারপর যে মুহূর্তে বুঝলাম একটু ভাল বোধ করছি—সোজা বাইরে। সার্কাসের দ্বিতীয় অংশের 'শো' আর দেখলামই না।

পরদিন।

ইভাকে বললাম, এটা তোমার দোষ, তুমিই আমার মাথায় ঐ সব পাগলামি ঢুকিয়ে দিয়েছ যে আমি খুব বড় একজন। আসলে ঐ মহিলা ঠিকই বলেছিলেন আমি একটা সামান্য পুঁটি মাছের চেয়ে বেশী কিছু নই। ইভা আমাকে জড়িয়ে ধরে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছ, আসলে লোকটা ভয় পেয়েছিল আর সেজন্যই সে তোমাকে হাতির পিঠে তুলে···আহ্ হাতির পিঠে তোমায় চমৎকার মানিয়েছিল জানো! খুবই দুঃখের কথা তুমি পড়ে গেলে।

নাঃ। এরপর কিছু বলার থাকেনা। অন্য লোকের কাছে আমি যা-ই হই না কেন তার কাছে আমি—

কিন্তু বলতে পারেন মেয়েরা যখন ভালবাসে তারা পুরুষের মধ্যে কী দেখে?

[পুওর ফিশ্ গল্পের অনুবাদ]

নিয়ন্ত্রিত যীশু

সুশীলেন্দু কোনার

হরমোহন হনহন করে বাড়ির দিকে হাঁটছে। অফিস থেকে তার বাড়ি মাইলখানেকের পথ। এজন্যে সে বাসের ঝক্কিতে আর যায় না আজকাল। বছর দুই হল হেঁটেই যাতায়াত শুরু করেছে।

সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে কলকাতা শহরে। সেই গাঁয়ে যেমন সূর্য্যি ডোবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত আলো থাকত, দিনের আলো যাই যাই করেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সন্ধ্যের জন্যে আসর ছাড়ত না, তেমনটি কলকাতা শহরে ঘটে না। কলকাতার দোকানদার-সমাজ যেন দুপুর থেকেই কাউন্ট ডাউন শুরু করে, কখন সূর্য্যি মামা টুকচেন পশ্চিমে ঢলবেন, তার গাঢ় বুককে লালের আভায় টকটকে করবেন, এবং অমনি তারা একযোগে সবাই তাদের বিজলীবাতির সুইচে হাত টিপবে। বিজলী বাতির সুইচ টিপে এরা যেন সূর্যকেও নিয়ন্ত্রিত করে ফেলেছে।

অবিশ্যি হরমোহন যুক্তিহীন অবিবেচক নয়। সে দেখেছে, গাঁয়ের লোকেরা যতক্ষণ অব্দি বিদায়ী সূর্যের করুণ লজ্জারাঙা মুখটা দেখতে পায়, শহরের লোকেরা, বিশেষতঃ কলকাতা শহরের লোকেরা, ততক্ষণ অব্দি তা দেখতে পায় না। হরমোহনের কিশোর বয়সের সেই যে অনুভূতি যে, সূর্য অত অমিত বিক্রম হয়েও শেষ অবধি রাত্রির মত অমন নমনীয় নারী সুলভ গাম্ভীর্যের কাছে হার মেনে ক্রমে বিকেল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জানত হয়ে হাঁটু মুড়ে, রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নেয়, তা দেখবার বা অনুভব করবার মত ফুরসত কলকাতার লোকেরা পায় না। এখানকার আকাশছোঁয়া প্রাসাদ আর মানুষের অকারণ কর্মব্যস্ততা তাতে বাদ সেধেছে। তার সঙ্গে কেউ জুটেছে এই বিজলবাতি।

কলকাতা শহরে সন্ধ্যে নেমেছে।

অফিস থেকে আজ হরমোহনের বের হতে দেরী হয়েছে। তাই সে অমন চোখের সামনে এসব দেখতে পাচ্ছে। যতদিন সে বেরুতে দেরী করেছে,

ততদিনই হরমোহন এসব লক্ষ্য করেছে। তেমন ঘটনা, বলা নিষ্প্রয়োজন, খুব কম ঘটে। নইলে, অন্যান্য দিন হরমোহন এতক্ষণ বাসায় পৌঁছে যায়। তার নিম্নবিত্ত কেরানীমার্কা সংসারটায় সে এ সময় স্নেহময় বাবা, প্রিয়ভাষী স্বামী এবং সর্বোপরি গৃহকর্তা। সে এসময় বিছানার ওপর বসে বাটিতে পেঁয়াজ কুচানো মুড়ি নিয়ে খেতে বসেছে, এবং তার ছেলেমেয়ে দুটির সঙ্গে তাদের সেদিনের অভিজ্ঞতার গল্প শুনছে। মাঝে মাঝে তার বৌ রেখা তার শীর্ণ শরীরের রেখা নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বউটা যে তার কেন এমন শীর্ণ, তা ভেবে পায় না হরমোহন। অসুখটসুখ তেমন নেই বলেই হরমোহনের ধারণা, তবু সে কেন যে একটু মোটাসোটা হয় না। হরমোহন রাস্তায় কতো ভাগর ভোগর বউ দেখেছে, মেয়ে দেখেছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের শরীরগুলোও কেমন নাদুস নুদুস নরম নরম। সেসব শরীরের সব জায়গাতেই হাত রেখে আরাম পাওয়া যায়, অথচ রেখার শরীরের সবটাই যেন শুধু হাড়, স্তনের মত নরম অংশটাও কেমন যেন হাড় হাড় ঠেকে। ওর বুকে আজকাল আর হাত দিতেই ইচ্ছা করে না। তবে হরমোহনের সুখের কথা, রেখা গিন্নী হিসাবে খুব পটু, ছেলেমেয়েদের যত্ন নেয়, ঘরদোর সাফসুফ রাখে, তাকেও খুব আদর করে ভালবাসে এবং বেশ গুছিয়ে হরমোহনের কেরানীর দাসখতের বিনিময়ে প্রাপ্ত সামান্য কটা টাকায় সংসারটা চালায়। অন্ততঃ হরমোহনের পঁয়ত্রিশ বছরের নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনে যতটুকু পেয়ে যতটুকু সুখ পাবার কথা, ততটুকু মোটামুটি সে পেয়েছে।

তবু এই মুহূর্তে হরমোহনের মনটায় আর একটু অখুশীর কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করছে। তাদের সেকসনে যে মেয়েটি বছরখানেক আগে তার চোখের সামনে টাইপিষ্টের চাকরী পেল, সেই কেমন হাবাগোবা, চট্‌চটে মুখ, সাদামাঠা মেয়েটা, বছর না ঘুরতেই অমন ডগমগে হয়ে উঠল। পোষাক টোষাক যা পাল্টেছে তা নিয়ে হরমোহনের কোন অভিযোগ নেই, তবে মুখটা অমন পাল্টে গেল সেইটেই দুঃখের বিষয়। অফিসে আজ টিফিনের সময় হঠাৎ মাদার টেরেসার কথা আলোচনা হচ্ছিল। মেয়েটি অমনি খলবলিয়ে উঠেছিল।

—ভাবুন তো যে মেয়েদের আপনারা এতদিন শুধু ঠেঙিয়ে এসেছেন,

তাদেরই একজন প্রতিনিধি কি রকম প্রেম বিলিয়ে চলেছেন। অমন খাটুনি…

—শুধু ঠেঙিয়ে আসার অভিযোগটা একপেশে। মৃদু আপত্তি করেছিল হরমোহন। সে অন্ততঃ তার জীবনে ছেলেবেলায় একবার বোনকে মারা ছাড়া কখনো মেয়েদের গায়ে হাত তুলেছে বলে মনে পড়ে না। ঝগড়াঝাঁটি যে একটু আধটু হয় না তা নয়। তবে সেটা তো দাম্পত্য জীবনের একটা পূর্ণতাপূরণ।

এইসব হতে হতেই আলোচনার মোড় ঘুরেছিল ধর্মের দিকে। কে যেন বলছিল, আসলে খ্রীস্টধর্ম থেকেই মাদারের এ প্রেরণা। তিনি সব মানুষের মধ্যেই যীশুকে দেখেন। অমনি মেয়েটা গায়ে পড়ার মত চড়বড়িয়ে বলে বসল, 'হিন্দু ধর্মটা হচ্ছে চামারের ধর্ম। এখানে ত্যাগ নেই, শুধু লোভ। আমি যাবা পারলে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করবো। ঢুকে যাবো মাদারের দলে। প্রেম বিলোব।'

একথা শুনে খুব রাগ হয়েছিল হরমোহনের। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অতবড় কটু কথা বললে কার না রাগ হয়। আজকাল এটা যেন ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এত অহংকারটা কিসের বাবা? হরমোহন ভাবে, ধর্মত্যাগ করতে চাস করনা, বাধা দিয়েছে কে? তা বলে অমন গাল দেবার অধিকার তোকে কে দিয়েছে! অত কি তোর যৌবনের অহংকার! তড়বড়িয়ে শুধু সব জায়গায় র‍্যাডিকেল হবার সাধ।

বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে হরমোহন। গলির ভেতর দূরে তার ঘর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে বলে মনে হল না হরমোহনের। বিপদ আপদের আশঙ্কায় সে আর একটু দ্রুত পা চালাল। বুকটা ঢুকঢুক করতে থাকল।

একটু ফাঁকার ওপরে একটা দু-কুঠরী ছোটঘর। ছোট একটা উঠোনও আছে। রান্নাঘর আলাদা। কলকাতা শহরের অনুপাতে ভাড়া দিতে হলে হরমোহন কোনদিন এমন ঘরের কথা ভাবতেই পারত না। আসলে, তাদের পাশের গাঁয়ের এক ফুর্তিবাজ লোক এ ঘরটা করেছিল, মাঝে মধ্যে কলকাতায় এসে ফুর্তি করতে এসে থাকবার জন্য। সে একেবারে বুড়ো হয়ে পড়ায়;

হরমোহনকে অল্প ভাড়ায় থাকতে দিয়েছে। তার ঘরটা পাহারা দেবার জন্যেও তো একটা লোকের দরকার।

দরজায় তড়িঘড়ি কড়া নাড়তে গিয়ে হরমোহন দেখল দরজা ভেতর থেকে খোলা। আরো একটু ভয় পেল সে। ভোর সন্ধ্যেয় এমন দরজা খোলা থাকার লক্ষণ স্বাভাবিক নয়। সে দ্রুত পা চালিয়ে উঠোনে এসেও দেখল অন্যান্য নিয়মের ব্যতিক্রম। পিটি খোকন এগিয়ে এলো না। তাদের মাকেও দেখা গেল না। সঙ্গে জোর দিয়ে দু-বার ডাকল, 'খোকন, খোকন, ও পিটি?'

—ওই তো বাবা এসে গ্যাছে। ভেতর থেকে পিটির গলা শোনা যায়।

হরমোহন দাওয়ায় ওঠে, বারান্দার আলোটা জ্বালতেই শোবার ঘর থেকে খোকন বেরিয়ে এল। হরমোহন অনেকটা আশ্বস্ত হল। বলল, 'ঘরে আলো জ্বালিস নি কেন?'

—মায়ের খুব শরীর খারাপ বাবা।' খোকন শুকনো মুখে জবাব দিল। 'বিকেল থেকে কেমন ছটফট করছে দেখবে এসো।'

হরমোহনের হঠাৎ খেয়াল হল এখন রেখার প্রেগনান্সি ষ্টেজ। কিন্তু সন্তান হবার এটা তো ঠিক সময় নয়। রেখার হিসাব মতো সেটা আরো দু' আড়াই মাস যাবার কথা। হিসাবে ভুল থাকার কথা না, কেননা এ নিয়ে তাদের অনেক আলোচনা হয়েছে। রেখার গর্ভস্থ এই তৃতীয় সন্তানটি হরমোহনকে অনেক দ্বিধায় ফেলেছে। একে সে সরকারী কর্মচারী, তায় আবার তৃতীয় সন্তান বর্তমান সমাজে অনভিপ্রেত। তার এই তৃতীয় সন্তানটি অনেক বিপদ ডেকে আনতে পারে। তার অপর দুই অগ্রজ এবং তাদের পিতা-মাতাদের পেটের ভাত সে একাই খেয়ে দিতে পারে চিরদিনের জন্য। এ সন্তান তারা চায়নি।

কিন্তু যা চাওয়া যায় না, তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। মানুষের কোন দুর্বলতম মুহূর্তে এই অপ্রার্থিত জিনিষটি টুপ করে এসে যায়। যেমন চলে এসেছিল এই তৃতীয় সন্তানটি রেখার গর্ভে। এলে গেলেও, তাকে নিয়ে তখনই বিশেষ চিন্তায় পড়েনি হরমোহন। কিন্তু এখন তার কাছে ব্যাপারটা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার পরিবার নিয়ন্ত্রণের ওপর অত্যন্ত জোর দিচ্ছে। ছেলেটির সংখ্যা থেকে কমিয়ে তা দুটি

করা হয়েছে। সব রাজ্যে, হরমোহন দুঃখিত চিত্তে লক্ষ্য করেছে, সরকারী কর্মচারীদের ওপর এটা বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে। একটি রাজ্যে এমন ঘোষণাই করা হয়েছে যে কোন কর্মচারীর যদি দুটির বেশী সন্তান হয় তবে তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত পর্যন্ত করা যাবে। হরমোহন আশংকিত হয়ে দিন গুনছে, কবে তার রাজ্যেও এমন ঘোষণা হয়ে যায়।

ঘনিষ্ঠ বন্ধু বিমলেন্দুর সঙ্গে এ নিয়ে হরমোহন অনেক আলোচনা করেছে। বিমলেন্দুর দূর দৃষ্টি প্রখর। তার এখন মাত্র একটি সন্তান। বিমল বলে তার ধারণা, সব দিক দিয়ে তৃতীয় সন্তান হওয়াটা এখন খুবই বিপজ্জনক। তৃতীয় সন্তানটি যত বাড়তে থাকবে, তোমার ভবিষ্যত জীবনে উন্নতির সম্ভাবনা তত কমতে থাকবে। এবং এক সময় হয়ত দেখবে তোমার চাকরীটিও আমূল তার পেটে ঢুকে গেছে। অন্তত: সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তবু যখন রেখার গর্ভে তৃতীয় সন্তানটি এলো, বিমলেন্দু তখন পরামর্শ দিয়েছিল কোন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে। গর্ভপাত দেশে এখন আইনসিদ্ধ।

তখন অমনিতেই অনেকটা দেরী হয়ে গিয়েছিল, তার পরেও হরমোহন দ্বিধা সংকোচে গড়িমসি করে ডাক্তারের কাছে গেল, তখন নির্ধারিত সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, টার্মিনেট করা অসম্ভব নয়, মায়ের স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে তা করানো যায় বটে, তবে কুড়ি সপ্তাহের পর কোন ভ্রূণকে অপারেশন করা বেশ একটু বড় রকমের ঝুঁকি নেওয়া।

রেখার স্বাস্থ্য এমনিতেই খুব দুর্বল। তার আবার এই বড় রকমের অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি নেওয়ার মত সাহস পায়নি হরমোহন। তারপর থেকে, অনেক ভেবেছে, এই অবাঞ্ছিত সন্তানটির হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে, কিন্তু কোন সুষ্ঠু পথ সে এখনো ভেবে পায়নি। এক একসময় সে নিজেদের সংসারের কথা ভেবে, অস্ত্রোপচার করার ঝুঁকি নিতে সাহসও করেছে, তবু শেষ মুহূর্তে সে পিছিয়ে এসেছে। শেষমেশ বিমলেন্দু পরামর্শ দিয়েছে, 'অপেক্ষা কর। সন্তানটা জন্মাক, তারপর ভেবে দেখা যাবে। তখন একটা পথ নিশ্চয় মিলবে।'

সেই ভরসায় আজ সন্ধ্যেতক্ কাটিয়ে হরমোহন তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকল। দেখল শুধু মেঝেটায় ওপর রেখা কুঁকড়ে শুয়ে আছে। যন্ত্রণায় বেশ আড়ষ্ট। তার ডান হাতটা তার ঈষৎ স্ফীত পেটে, বাঁ হাতটা বন্ধ করা চোখের ওপর। বেশ তীব্র যন্ত্রণা পাচ্ছে। হরমোহন তার দিকে এগিয়ে গিয়ে, পাশটায় বসল। তার কপালে মৃদু একটু হাত স্পর্শ করে ডাকল, 'রেখা।'

—উঁ।

—খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?

হুঁ।

—খু উ-ব?

—হুঁ।

—ডাক্তারকে খবর দেব?

হুঁ।

অতএব, হরমোহনের প্রথাসিদ্ধ কাজগুলি সব পড়ে রইল। ধুতি ছাড়া হল না, পা ধোয়া হল না, তাকে কেউ পেঁয়াজ কুচানো মুড়িও এগিয়ে দিল না। সে খোকন আর পিন্টিকে ডাকল,—তোরা মায়ের কাছে একটু বোস। আমি এক্ষুনি একবার বাইরে থেকে আসছি।

বাইরে এসে হরমোহনের হঠাৎ খেয়াল হল, এক্ষুণি ডাক্তার ডাকা কি খুব উচিত হবে? তার চেয়ে একবার বিমলেন্দুকে ডাকলে হত। এখন যা কিছু করা, তা বিমলেন্দুর সঙ্গে পরামর্শ করেই করা উচিত। কিন্তু কিভাবে ডাকা যায়, তার বাড়িটাতো অনেক দূরে, ঘরে রোগী রেখে অতদূরে যাওয়া তার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। হঠাৎ হরমোহন উল্লসিত হল, আজ শুক্রবার। বিমলেন্দু একটা সাপ্তাহিকের সঙ্গে যুক্ত। আজ সে ঐ পত্রিকার অফিসে থাকে। কিন্তু তাদের ফোন নম্বরটা হরমোহনের জানা আছে বলে মনে পড়ল না।

সে তাড়াতাড়ি সদর রাস্তায় এসে একটা চেনা ওষুধের দোকানে ঢুকে গেল। ওদের টেলিফোন ডাইরেক্টরী থেকে প্রেসের ফোন নম্বরটা যোগাড় করে ডায়াল করল। ওপাশ থেকে কিছু স্পষ্ট শোনা যায় না। কতকগুলো একটানা শব্দ কানে বাজতে থাকে। ক্রস কানেক্সন্ রিসিভারটা রেখে আবার ডায়াল করল। বিমলেন্দুকে ডেকে দিতে বলল।

বিমলেন্দু ফোন ধরতেই হরমোহন বলল, 'বিমলেন্দু, রেখার হঠাৎ বিকেল থেকে লেবার পেইন উঠেছে। তুই একবার আসতে পারিস?

—এক্ষুণি যাচ্ছি। ডাক্তারকে খবর দিয়েছিস নাকি?

—না। দেবো?

—না না। এক্ষুণি ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন নেই, 'বিমলেন্দু জবাব দেয়, 'একটু প্রাইভেসী মেনটেইন করা দরকার। ডেলিভারী সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কি?

—কি করে বুঝবো?

—ঠিক আছে। আমি একজন পরিচিত নার্সকে সঙ্গে নিয়ে একটা ট্যাক্সি করে তোর কাছে পৌঁছে যাচ্ছি। তুই বাসায় যা।

হরমোহন বাসায় ফিরে এলো। দেখল রেখা এবার যন্ত্রণায় কাতরাতে শুরু করেছে। তার মুখের দিকে তাকাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। খোকন শিটি মায়ের মুখের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে যন্ত্রণাক্ত হচ্ছে। হরমোহন অসহায়ভাবে ভাবল ডাক্তার না ডাকা বা হাসপাতালে না নিয়ে যাওয়াটা তার ভুল হচ্ছে। তখনই বিমলেন্দুর কথাটা কানে বাজল, 'একটু প্রাইভেসী মেনটেইন করা দরকার।' খুবই অসহায় বোধ করছে হরমোহন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন নার্সকে ধরে নিয়ে বিমলেন্দু এলো। হরমোহন ছেলেমেয়েকে ডেকে নিয়ে বাইরে এল। নার্স ভেতরে গিয়ে রোগীকে পরীক্ষা করল। বিমলেন্দু ও হরমোহন তখন দাওয়ার সিঁড়িতে বসেছে। বিমলেন্দু বলল, 'সিস্টারকে আমি ট্যাক্সিতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছি। তৃতীয় সন্তানের ব্যাপারটাও বলেছি। এবং যতটা সম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজনটাও অবহিত করেছি।'

হরমোহন একটু আশংকিত হল। এত যন্ত্রণা দিয়ে যে ছেলেটা জন্ম নিচ্ছে, সে ভবিষ্যতে আরো কতো যন্ত্রণা দিতে পারে ভেবে, বর্তমানের যন্ত্রণাকে সে কিভাবে চাপা দেবে ভেবে পেল না। ইতিমধ্যে নার্স রোগীকে পরীক্ষা করে এসে বলল, 'ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে ডেলিভারী হবার সম্ভাবনা।'

আতঙ্কিত হরমোহন তার দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'কোন ভয় টয়ের ব্যাপার নেই তো?

—নাঃ। পেইনটা একটু বেশী হচ্ছে এই যা। ও ঠিক হয়ে যাবে।'

এরপর বিমলেন্দু এবং হরমোহন মিলে পাশের কুঠরীটা পরিষ্কার করে দিল। রেখাকে ধরাধরি করে সে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। বিমলেন্দু বলল, 'দোকান থেকে কাটটুটি নিয়ে এসে বাচ্চাগুলোকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দে। ওদের কষ্ট দিয়ে লাভ কি।'

হরমোহন তাই করল। রাত ন'টা নাগাদ পিন্টি খোকন খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পিন্টিটা বায়না ধরছিল জেগে থাকবে, তবু হরমোহন তাকে জোর করে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

ঠিক দশটা ছাব্বিশ মিনিটে নবজাতকের কান্না শুরু হল। হরমোহন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অনুভব করল তার অবাহিত তৃতীয় সন্তান জন্ম নিল। নার্স জানাল সন্তানের মা সুস্থ আছে তবে সাময়িক একটু অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। বাচ্চাটা খুব রুগ্ন। তাছাড়া অসময়ে জন্ম নেওয়ায় তার পুষ্টি ঠিকমত হয়নি।

—ভাটস্ আইডিয়া। বিমলেন্দু হঠাৎ মুহ উঠে দাঁড়াল। হরমোহন ওর মুখের দিকে তাকাল। বিমলেন্দু বলল, 'মনটাকে একটু শক্ত কর হরমোহন। ধরে নে একটা মৃত সন্তান জন্মেছে।'

—তার মানে? বিমলেন্দুর মুখের দিকে তাকাল হরমোহন। একটা জল্লাদের মত দেখাচ্ছে।

—বাচ্চাটাকে হয় মেরে ফ্যাল না হয় চুপি চুপি কোথাও ফেলে দিয়ে আয়, আপনাআপনি মারা যাবে। ওর মা অজ্ঞান হয়ে আছে, এইটেই সুযোগ।

—না-না না।

—না না কিরে? ভাবতো কি অসম্ভব সর্বভুক ক্ষিদে নিয়ে জন্মেছে এ ছেলেটা। তোদের সবাইকে খেয়ে ফেলবে হয়তো একদিন।

—অসম্ভব। বেঁকে বসল হরমোহন। এমন কাজ তার পক্ষে করা অসম্ভব।

—কেন অসম্ভব? হাজার হাজার অবিবাহিত পিতামাতারা যা করে এসেছে, তা তোর সংসারের সত্যিকারের প্রয়োজনে, জীবিকার প্রয়োজনে অসম্ভব কেন?

এরপর এক আশ্চর্য বিতর্কের ঝড় উঠলো। আইন, নীতিবোধ, পাপবোধ

একসঙ্গে বিতর্কের ময়দানে নেমে পরস্পরের গতীব যোজনা করল। অসহায় হরমোহন তার মধ্যে পড়ে আরো অসহায় বোধ করল। এক সময় কোণঠাসা হয়ে পড়ল বিমলেন্দুর শেষ কথায়,—সময় কিন্তু বেশী নেই হরমোহন। বাচ্চার মায়ের চৈতন্য ফিরতে দেরী হবে না। আর দু-এক মিনিটের মধ্যে তোকে এতবড় দায়িত্বের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এখন ভুল করলে, সারাজীবন তোকে অনুতাপ করতে হতে পারে।

বিতর্ক এবার অর্ন্তদ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হল। এক অলৌকিক দ্বন্দ্ব হরমোহনের মনকে তোলপাড় করতে থাকল। বিপর্যস্ত করে তুলল মন। হরমোহন অনুভব করে দুই বিশাল বিমুখী কালবৈশাখী ঝড় তার মনের মধ্যে অবিরাম সামনাসামনি লড়াইয়ে নেমেছে। হারতে একজনকে হবেই। হরমোহন প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। যেন মুক্তিপণ হিসাবে তার সামনে খোকন পিন্টি আর রেখাকে দাঁড় করানো হয়েছে। এদের যদি সে বাঁচাতেই চায়, তবে নবজাতককে বিসর্জন দিতেই হবে।

এই সময় একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে আজ দুপুরের অফিসের আলোচনাগুলো তার মনে ভেসে উঠল, কাগজে দেখা বলিরেখাময় একটি উজ্জ্বল হাসি হাসি মুখ। নীল ডবল লাইন বর্ডার দেওয়া সাদা শাড়িতে ঢাকা সে পবিত্র মুখখানি।

ঝটিতি হরমোহন সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। ঝটপট উঠে দাঁড়ায়। বিমলেন্দু আশান্বিত হয়। বলে, 'কি করবি ?'

—ওকে বিসর্জন দেবো।

তাড়াতাড়ি সে প্রসূতির ঘরের সামনে আসে। রেখা এখনো অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। তার দিকে তাকাতে করুণা হল হরমোহনের। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক চিরে। সিষ্টারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল বিমলেন্দু। সিষ্টার একটা তোয়ালেতে মুড়ে নবজাত সন্তানটিকে কোলে তুলে দরজার কাছে এগিয়ে এল। হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে অসহায় কেরানী হরমোহন। সিষ্টার তার মুখের দিকে একবার গভীরভাবে তাকাল। হরমোহন চমকে উঠল। কি বলতে চায় সিষ্টার ? কি বলতে চায় এ নারী ?

সিষ্টার হরমোহনের হাতে বাচ্চাটাকে তুলে দিল। হরমোহন জীবন্ত পুতুলটিকে কোলে জড়িয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল। কৃষ্ণকে জন্মস্থানের

প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষা করার জন্যে বাবা বসুদেব বুকে আগলে তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হরমোহন নিয়ে গেল তাকে বিসর্জন দিতে।

দিন দুয়েক পরে বিপর্যস্ত হরমোহন ঘর থেকে বেরুল। আনমনা এখান ওখান ঘুরতে ঘুরতে এক সময় খেয়াল করল যে সে মাদার টেরেসার নির্মলা শিশুভবনের গেটের কাছে এসে পড়েছে। ভেতরে বোধহয় অনেক সাংবাদিকের ভীড়। পায়ে পায়ে সে ভেতরে এল। দেখল মাদার একটা দিন তিনেকের রুগ্ন অপুষ্ট শিশুকে কোলে নিয়ে যত্ন করছেন। সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করল, এ শিশুটি কার? একে কোথায় পেলেন মাদার?

মাদার ছেলেটির যত্ন করতে করতে তাঁর বলিরেখাময় মুখে হাসি ফুটিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'মেরী মাতার সন্তান। তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার দায়িত্ব একে ক্রশ থেকে রক্ষা করা।'

একরাশ আলো বিচ্ছুরিত হয়ে ওঠে হরমোহনের মুখে চোখে। তার পা দুটি খুব হালকা বোধ হয়। সে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে ফিরতে থাকে। চোখের সামনে রেখার শীর্ণ মুখ ভেসে ওঠে। কালই একবার মেরী মাতাকে নিয়ে আসতে হবে আশ্রমে। দেখে যাবে তার শিশুকে, নিয়ন্ত্রিত যীশুকে।

গল্পের কস্তুরী

মীনা ভৌমিক

অনিমা চিরকালই হেঁয়ালীপূর্ণ কথা বোলে ভাসিয়ে দিত নিজেকে হাসির অন্তরালে। একবার যেমন ক্লাসে কথা উঠলো, কে কার লেখা পড়তে ভালবাসে। সবাই যে যার পছন্দমত লেখক-লেখিকার নাম বলছে। তার মাঝে অনিমা অদ্ভুত এক উত্তর দিয়ে বসলো। "আমি বাবা কারো লেখাই পড়তে ভালবাসি না। গল্প আবার পড়বো কি? আমার নিজের জীবনের ভাঁজে ভাঁজেই তো রয়েছে গল্পের প্লট।" কথাটা শুনে আমরা অনেকেই ওকে অহঙ্কারী ভাবলাম। ও নিজেকে খুব একটা উল্লেখযোগ্য ক্যারেক্টার মনে করে নাকি! সবিতা তো বোলেই ফেলেছিল, "তবে তো লেখক পাড়ায় তোরই সমাদর"। অনিমাও বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই বললো, "বলতে পারিস ভাই। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাছে তো আমার ভাইরিটা আজও রয়েছে। অবশ্য উনি বলেছেন, আমার নামটা উপন্যাসে পাল্টে দেবেন।" ক্লাস শুদ্ধু মেয়ে হেসে গড়াগড়ি যায় অনিমার কথা শুনে। তারপর থেকে ওর নামই হ'য়ে গেল, 'গল্পের কস্তুরী।' ও তাতে আপত্তি জানাতো না বা কোনরকম ইনসাল্ট ফিল করতো বোলেও মনে হয়নি। তারপর বি. এ পাশ করার পর আমরা ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেলাম। আমার বিয়েও হ'য়ে গেল। সব বন্ধুদের সাথে অনিমাও নিমন্ত্রিত ছিল। তবে ও আসেনি। আমি সেজন্য খুব একটা অবাক হইনি। কারণ ওর কোন কিছুতেই সিরিয়াসনেস্ নেই।

নতুন সংস্পর্শে এসে পুরোনো সব কিছুই ভুলের অনুগামী। বিশেষ করে অনিমাকে তো একেবারেই ভুলে গেলাম। ও নিজেকে যতই আহা মরি মনে করুক, আমরা ওর মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই পাইনি মনে তুলে রাখবার মত।

এমনি বছর তিন কেটে গিয়ে সেদিন হঠাৎ দেখা অনিমার সাথে। ইষ্টার্ণ ট্রেডিং এর সামনে। বিপরীত ফুটপাথে। একাই দাঁড়িয়ে আছে। বেশবাস দেখে মনে হ'চ্ছে কোন বড়লোকের গৃহিণীই হ'য়েছে। স্বাস্থ্যটাও যেন আগের চাইতে ভাল হ'য়েছে। দেখতে অবশ্য বরাবরই ভাল ছিল। আমাকে দেখতে পায়নি। আমি এগিয়ে গিয়ে পাশে দাঁড়ালাম। তবু ওর দৃষ্টি দূর পথ

ছুঁয়ে আছে। আস্তে বললাম—কি-রে, এত বড় কাণ্ডটা কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি সেরে ফেললি!

—আ-রে, তু-ই? একেবারেই চটপট হ'য়ে গেছেরে কাজটা!

—ঠিক আছে, এখন আর সেজন্য দুঃখ করে লাভ নেই। এখানে একা একা দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন?

—ও একটু ইষ্টার্ণ ট্রেডিং এ ঢুকেছে। ফ্রিজটা খারাপ হ'য়ে গেছে কি না?

—এর পরেও মনে হয় তোদের কোথাও যাওয়ার প্ল্যান আছে।

—কি করে বুঝলি?

—তোর পোষাকের মাজা দেখে। অনিমা হাসলো। কোথায় যাবি?

—ওর প্রমোশন আনতে।

আমি বিস্ময়ে বলি—ওর প্রমোশন আনতে তুই কেন?

—ধু-র তুই এখনও হাবলা রয়েছিস। কিস্‌স্যু বুঝিস না। স্বামীদের উন্নতি, অবনতি সবকিছু বউদের উপর নির্ভর করে।

—কি জানি বাবা, আমরা সাধারণ কেরানীর বউ অতসত বুঝি না।

—এখন আমরা যাচ্ছি ওর জেনারেল ম্যানেজারের সাথে 'বারবধূ' দেখতে। সেখান থেকে গ্র্যাণ্ড, তারপর মধ্যরাতে বাড়ী। এবার বুঝলি তো। কথাটা শেষ করে হাসিটা ঠোঁটে চেপে রাখলো।

—কি জানি বাবা। তা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন?

—জেনারেল ম্যানেজারের গাড়ী আসবে।

আমি ভাবলেশহীন ভাবে বললাম—ওঃ।

—তুই কোথায় যাচ্ছিস?

—আমিও ইষ্টার্ণেই যাবো। তবে ফ্রিজের প্রবলেম নিয়ে নয়। সামান্য একটা হিটার কিনতে। ছেলেটার দুধ গরমের খুব অসুবিধে হচ্ছে। আমার কথা শেষ হ'তেই ও বললো—ঐ ও আসছে। আমিও ওর সঙ্গে দৃষ্টি ছুড়ে দিলাম ইষ্টার্ণ ট্রেডিং এর দরজায়। ভাবলাম, না অনিমার পছন্দের তারিফ করতে হয়। আমি বললাম—আচ্ছা অনিমা, আমি চলি। ভেবেছিলাম ও হয়ত বলবে, "দাঁড়া ওর সাথে আলাপ করিয়ে দি।" ও সব না বলে বললো—আচ্ছা, আবার হয়ত কখনও দেখা হবে।

বাড়ী এসে আবার কাজেকর্মে মিশে গিয়ে ভুলে গেলাম অনিমাকে। তবে মাসের মাঝামাঝি এলেই যখন সংসারের হাল টানতে একটু বেশী রকম সতর্ক হ'তে হয় তখন পথে দেখা অনিমা আমাকে খুব কষ্ট দিতে লাগলো। মনে মনে দুজনের রূপগুণের হিসেব করি। ভাবি কোনদিক থেকেই ও আমার থেকে বেশী ছিল না। যা একটু দেখতে ভাল ছিল। মনের এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় সমীর বাড়ী এলে। ওর সামান্য কথাতেই আমার মাথা ধরে যায়। হঠাৎ আমার মনে বাসনা এলো খোকার জন্মদিন করবো। এটা প্রায় অনিমার সাথে দেখা হওয়ার ন'দশ মাস বাদে। সমীরকে বলতে ও বলে—হঠাৎ?

আমারও খুব রাগ হোলো, বললাম—হঠাৎ আবার কি. সবাই করে আমি ও করবো।

সমীর মার্জিত স্বভাবসম্পন্ন। ধীরে বললো—সবাই করে তারা হয়ত পারে। আমি পারি না করি না। দু' বছর তো এমনিই কাটলো।

—দু' বছর কাটলো, তিন বছর থেকেই শুরু হবে। ও আর আপত্তি করলো না।

ও আপিসে বেরিয়ে যেতে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে খোকাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। খুব ভাল লাগছে। খোকার তিন বছরে এই প্রথম জন্মদিন করবো। সমীর বোলে দিয়েছে, বেশী বড় দোকানে ঢুকোনা, রিসনেবলি দাম নিয়ে নেবে। শ্যামবাজারে ছোট একটি দোকান থেকে খোকার জামা প্যান্ট আর পাশের দোকান থেকে খেলনা কিনে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি; দেখি অনিমা। হাতে বেতের ঝুড়ি-ব্যাগ। কিছু আনাজপাতি তাতে। আজ যেন পোশাকে তেমন চটক নেই। তেমন কেন, একেবারেই নেই। অনিমা এদিকেই আসছে। বাঃ অনিমাকে দেখতে দেখতে বাসটা চলে গেল। বেশ ফাঁকা ছিল বাসটা। এর পর স্কুল, কলেজ, অফিসের ভীড় ভেঙ্গে পড়বে। অনিমা এবার আমার পাশ দিয়েই যাচ্ছিল। লোকের ভীড়ে আমি ওর দৃষ্টির আড়ালে।

—এই অনিমা। আচমকা হাতে টান পড়াতে চমকে উঠলো—আ-রে তু-ই? মুখে সেই পুরোনো হাসি। ওকে দেখেই আমার প্রমোশনের কথা মনে হোলো। জিজ্ঞেস করলাম—তোর কর্তার প্রমোশন হোলো? অনিমা হেসে বলে—হ্যাঁ—সে তো কবে। তুই দেখছি তুলিসনি তাহলে।

—এমন ইণ্টারেষ্টিং জিনিষ ভুলতেও ভুল হয়।

—যা বোলেছিস। এ কথায় সুরটা যেন আমার মতের সঙ্গে মিলে গেল। জিজ্ঞেস করি—কোন গ্রেড পেলেন?

—দেড় হাজার—দু' হাজার।

—পোষ্ট?

—বোম্বে ইউনিটের ম্যানেজার।

—তোর কর্তা তবে এখানে নেই?

—না—ও তো প্রমোশন পেয়েই বোম্বে চলে গেছে।

—তুই গেলি না?

—যাবো।

—তোর কিছু প্রমোশন মিলেছে?

—মিলেছে। হেসেই বললো অনিমা।

আমিও খুশীতে বলি—কি-রে, ছেলে না মেয়ে? অনিমা উত্তর না করে আমার খোকাকে কাছে টেনে নিল।

—আজ আর সময় নেই, নইলে তোর বাড়ীতে গিয়ে খোকাকে দেখে আসতাম।

—চল না। কথার সাথে অনিমা আমার হাতটা টেনে ধরলো।

—না-রে, বাড়ী ফিরতে দেরী হ'য়ে যাবে।

—দেরী হবে না। এই তো সামনেই আমার বাড়ী। যাবি আর আসবি। শুধু এক কাপ চা পাবি।

—ই-স্, ম্যানেজারের বাড়ীতে গিয়ে শুধু এক কাপ চা পাবো। বোললেই হোলো। গেলে ভাল করে ভুরি ভোজন করে তবে আসবো।

—বাড়ী ফিরতে দেরী হবে না তো? অনিমা দুষ্টু হাসে।

—হয় হবে।

—ঠিক আছে চল।

অল্প হেটেই অনিমার বাড়ীতে ঢুকলাম। কেমন যেন স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের মেঝেগুলো। জানলা কপাটগুলোও বহু পুরোনো। আমি বোলেই ফেললাম—অনিমা, দেখ তোর এ বাড়ীতে থাকা সাজে না।

—ভাল বাড়ী পেলে উঠে যাবো।

—কইরে তোর প্রমোশনের বস্তুটি কোথায় ?

—দেখাচ্ছি।

—ঘুমিয়ে আছে বুঝি ? কথার মাঝেই আমার দৃষ্টি চলে গেল মোনাধরা দেওয়ালে টাঙানো একটি ছবিতে,—তোর শাশুড়ির ছবি বুঝি ?

না, আমার মা।

—মাসীমার চেহারা আগে এমন ছিল ! আমার মা-ও ঠিক এমন বড় করে সিঁদুর টিপ পরতো। মাসীমাকে দেখে কিন্তু বিশ্বাসই হয় না ইনিই তিনি। ফটোতে চোখ রেখেই কথাগুলো শেষ করলাম।

অনিমা মৃদু হেসে বলে—কেন ?

—মাসীমা এখন কত মডার্ণ। আর সেইজন্যই বোধ হয় চেহারা পর্যন্ত পাল্টে গেছে। এবার অনিমা বেশ জোরেই হেসে ফেললো—তুই এখনও সেই হাব্‌লা,

—কেন ?

—এই ছবি সম্পূর্ণ আলাদা মানুষের।

—তবে, তুই যে বললি, তোর মা।

—হ্যাঁ— মা-ই তো।

—তবে, তিনি ? আমি যেন কেমন বোকা হ'য়ে রইলাম।

—তিনি বাবার বিয়ের আগের প্রণয়িনী। আমার মা মারা যাওয়ার পর তার আধিপত্য বিস্তার করেন আমাদের সংসারে।

—বা-ব্বা, এতদিনে গল্পের কস্তুরীর একটা প্লট পেলাম।

—কেন, সেদিন কলেজে তো খুব হেসেছিলি।

—কি করে বুঝবো বল। তোর স্বামী জানে এ সব ?

—মা-তুই দেখছি সত্যিই স্বামী বানিয়ে ছাড়বি।

—বা, স্বামীকে স্বামী বলবো না কি বলবো !

—এবার ও তুই অবাক হবি।

—কেন ?

—সেই ভদ্রলোক আমার স্বামী নন।

আর একটু হ'লে আমি চেয়ার থেকে পড়েই যেতাম। নেহাৎ যদি শক্ত করে ধরে না ফেলতাম,—স্বামী নয় তবে কি ?

—শুধু একটু অভিনয়। যতদিন ওর প্রমোশন না হয়। ভদ্রলোক সত্যিই অন্যদের মত নয়। নিজের স্ত্রীকে দিয়ে স্বার্থ আদায় করাটা অতি জঘন্য মনে করেন।

—তোর বাবা...। কথাটা শেষ না হতেই অনিমা টেনে ধরলো।

—আমার মা থাকলে হয়ত বাবার পক্ষে এ কাজটা করা সম্ভব হোতো না। বিয়ের আগের প্রাণয়িনী তো। তাকে চটানো মুস্কিল। তাছাড়া সেই ভদ্রলোকের বাবা আবার আমার বাবার বস্। শুনেছি বাবার মাইনের স্কেলটাও নাকি এক ধাপ উঠেছে।

রাঙ্গা সিঁথির দিকে তাকিয়ে রুক্ষ স্বরে বলি—সিঁদুর পরিস কার জন্য?

—কিছুটা নিজের নিরাপত্তা, আ-র মনে হয় অভিনয় করতে করতে কোথায় যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি।

আমি হতাশায় বলি—তোর চলে কি করে?

—সে ব্যবস্থা করে গেছে। লোকটা অবিবেচক নয়রে। ওদের বাড়ীর পুরোনো চাকর। পঙ্গু হ'য়ে দুটো চোখই যায়। আমার প্রমোশনের সাথে ওর ও থাকবার একটা ব্যবস্থা হোলো।

আমি যেন সত্যিই জটিল কোন গল্প নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। লেখক যে কোথায় তার সমাধান করেছে খুঁজে পাচ্ছি না। এমনি ভাবেই জিজ্ঞেস করলাম—তা-র-প-র?

—তারপর আর কি? ওর ও দেখাশোনা করার একটা লোক হোলো। আমারও বেঁচে থাকবার পথ হোলো। অনিমার কথা শেষ হ'তে সামনে এসে দাঁড়ালো কদর্য চেহারার কানা একটা লোক। আমি ভয়ে চোখ বুজে চেঁচিয়ে উঠলাম—মা-গো, এটা কে? খোকাও আমাকে আঁকড়ে ধরে মুখ ঢেকে রেখেছে।

—আমার প্রমোশন।

চোখ মেলে দেখি অনিমা এই কদর্য লোকটার হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল। পক্সের ক্ষতচিহ্ন মুখের আকৃতি যারপর নাই কুৎসিৎ এবং ভয়াবহ করেছে। লোকটা নোংরা ঝুলি ঝুলি সার্টটার পকেট থেকে অনেকগুলো খুচরো পয়সা বার করে অনিমার হাতে দিয়ে বললো—বাজারের ব্যাগটা দাও।

অনিমা বললো- তোমার শরীর ভাল নেই। আজ আর বেরোতে হবে না।

লোকটা বলে—রাতে খাবারের ব্যবস্থা আছে?

—আছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। অনিমা আমার চোখে চোখে রেখে বললো—তুই বড্ড সেন্টিমেন্টাল।

সে এক দুনিয়া

আনন্দ রায়

[বিজ্ঞানের জন্য সংবাদপত্র না, সংবাদপত্রের জন্য বিজ্ঞাপন কলকাতার প্রথম সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপন সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ আলোচনা.....]

কলকাতার জনগণকে ভাগ্যবান হওয়ার একটা সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে "প্রত্যেক ভদ্রলোক, নাবিক, দুঃসাহসী এবং যথার্থ তেজস্বী যুবক—যাঁরা দেশের শত্রুপক্ষের জাহাজ লুঠ করে সম্মানজনক সম্পত্তি লাভ করতে চান—তাঁদের জন্যে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল। "মৃত্যু অথবা গৌরব স্বর্ণতরী" নামে একটা সেরা পালের জাহাজ জেম ব্রেসীর পরিচালনায় ছ'টি বাইশ পাউণ্ড সোলায় কামান, বারোটি কোহর্ন এবং পঞ্চাশটি সুইভ্‌ল্‌ কামান এবং একশ' কুড়ি জন নাবিক নিয়ে পাঁচ মাস ধরে ওলন্দাজ, ফরাসী এবং স্পেনীয়দের জাহাজ লুঠপাট করার উদ্দেশ্যে কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা ত্যাগ করবে। নাবিকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হবে এবং তাদের কাজে বিশেষ উৎসাহ হিসাবে অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে।"

কোনও সংবাদপত্রে যে এ-ধরণের বিজ্ঞাপন ছাপা হতে পারে, এ কথা আজ কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু কল্পনা নয়, একদিন সত্যিই ঐ বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল কলকাতার বাসিন্দাদের ভাগ্যবান হওয়ার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। ছাপা হয়েছিল বাংলা দেশের প্রথম ছাপা সংবাদপত্রে। সে সংবাদপত্রের নাম —"বেঙ্গল গেজেট অব দি ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজারস্‌।" সম্পাদক—জেমস্‌ অগাষ্টাস হিকি। প্রকাশকাল ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে।

কোম্পানীর আমলের কলকাতায় খবরের কাগজের জন্মও এই বিজ্ঞাপনেরই প্রয়োজনে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, সে প্রয়োজনও প্রথম এক বিজ্ঞাপন মারফতই ব্যক্ত করা হয়—তবে ছাপা নয়, হাতে লেখা বিজ্ঞাপন।

১৭৬৮ সালে বোল্‌ট্‌স্‌ নামে এক ব্যবসাদার কাউন্সিল হাউসের দেওয়ালে হাতে লেখা এই বিজ্ঞাপনটি ঝুলিয়ে দেন :

Mr. Bolts takes this method of informing the publie that

the want of Printing Press in the city being of great disadvantage in business, and making it extremety difficult to communicate such intelligence to the community as is of the utmost importance to every British subject he is ready to give the best encouragement to any person or persons who are advised in the business of printing or manage a press, the typpes and utensils of which he can produce.

প্রথম জীবনে কোম্পানীর অধীনে চাকরি করলেও, পরে স্বাধীনভাবে ব্যাবসা করে আরও পাঁচজনের মতো বোল্ট্‌স্‌ও প্রচুর টাকার মালিক হয়েছিলেন। বোল্ট্‌স্‌ যে কত পাকা, উঁচুদরের ব্যবসাদার, তার প্রমাণ এই বিজ্ঞাপন। আজ থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই, ছাপাখানার কাজ জানে এবং টাইপ ও যন্ত্রপাতিও তৈরী করতে পারে এমন লোককে সাধ্যমতো সাহায্য করতে রাজী হয়েছিলেন ছাপাখানা খোলবার জন্যে। শুধু তাই নয়, বোল্ট্‌স্‌ ছিলেন সত্যিই দূরদর্শী। সে যুগে একাজ যে সহজে হবে না তা জেনেই ইতিমধ্যে নকলের জ্ঞাতব্য বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্যে তিনি এক অভিনব পরিকল্পনার কথাও ঐ বিজ্ঞাপনেই জানিয়ে দেন :

In the meantime he beggs leave to inform the Public that having in manuscript many things to commuunicate which most intimately coucern every individual, any person who may be induced by curiosity or otber morc laudable motives, will be petmitted at Mr. Bolt't house to read or take copies of the same. A per·on will give due attention at the hours from ten to twelve in the morning.

অর্থাৎ দরকারী বিজ্ঞাপন তিনি হাতে লিখে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। বিজ্ঞাপন দেখা বা নকল নেওয়ার জন্যে ঐ কাগজ তাঁর বাড়ীতে পাওয়া যাবে। আগন্তুকদের পরিচর্যার জন্যে রোজ সকাল দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত একজন লোকও সেখানে মোতায়েন থাকবে।

এইভাবে হাতে লেখা কাগজে বিজ্ঞাপনের জন্ম হলেও, বোল্ট্‌স এর নাম

কিন্তু আজ রাশি রাশি ছাপা বিজ্ঞাপনের তলায় চাপা পড়ে গেছে। ছাপা বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা তিনি করে উঠতে পারেননি। তবে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। হিকির দু'-পৃষ্ঠার কাগজের বেশির ভাগেই থাকতো বিজ্ঞাপন। সে কাগজ অবশ্য বেশিদিন টিকে থাকেনি, কিন্তু তার কারণ বিজ্ঞাপনের প্রাচুর্য নয়, অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ সম্পাদকীয় তার জন্যে দায়ী। হিকির কাগজ বন্ধ হয়ে গেলেও, বিজ্ঞাপনের চাহিদা, গুরুত্ব কিন্তু কমেনি। ১৮১৮ সালের ১লা অক্টোবর জেম্‌স্‌ সিল্ক বাকিংহামের সম্পাদনায় "ক্যালকাটা জার্নাল" ছাপার সময়েও সেই কাগজের নাম দেওয়া হয় "দি ক্যালকাটা জার্নাল অব্‌ ওরিয়েন্টাল অ্যাড্‌ভার্টাইজারস্‌।" কলকাতার দেখাদেখি মাদ্রাজে, কানপুরেও পরে "মাদ্রাজ অ্যাডভার্টাইজারস্‌" এবং "কানপুর অ্যাডভার্টাইজারস্‌" নামে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

অবশ্য সব কাগজের নামের সঙ্গেই যে "অ্যাডভার্টাইজারস্‌" শব্দটি যুক্ত থাকতো তা নয়, তবু সে যুগের অধিকাংশ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রই ছিল মূলত: 'অ্যাডভার্টাইজারস্‌।' কাগজের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলেও এ-কথাই প্রমাণিত হয়। বিষয়বস্তুর প্রথম ভাগ হ'ল: সরকারী ঘোষণা ও সংবাদ। দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ সম্পাদকীয় স্তম্ভে থাকতো—হয় কোনও সংস্কৃত স্তোত্র বা ফারসী কবিতার অনুবাদ বা মোগল দরবারের বিবরণ কিংবা ইংলণ্ডের নির্বাচন সংক্রান্ত রিপোর্ট, টুকিটাকি খবর বা সেকালের ফ্যাশান, নৈতিক আদর্শ, কল্পনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর লেখা প্রবন্ধ। এছাড়া সম্পাদকীয় স্তম্ভের এক অংশ জুড়ে থাকতো "পোয়েট্‌স কর্ণার' অর্থাৎ কবিতার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান। এই "পোয়েট্‌স্‌ কর্ণার,-এ প্রেমের কবিতা ছাপার রেওয়াজ ছিল। একেও ব্যক্তিবিশেষের বিজ্ঞাপন বলে ধরা চলে।

কাগজের তৃতীয় এবং মুখ্য ভাগ হ'ল: বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন প্রকাশের কোনও বাঁধা নিয়ম ছিল না। বিজ্ঞাপনদাতার টাকা আর মর্জির ওপরেই এটা নির্ভর করতো। তাই দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপন মারফত দ্বৈরথ যুদ্ধে আহতের কাছে বিজয়ীর ক্ষমা প্রার্থনা থেকে শুরু করে, বল নাচ, সাঁতার নাচ, কলকাতা—বারাসতের ঘোড়দৌড়, নতুন শুঁড়িখানার উদ্বোধন, কেশসজ্জা, পাত্রী সন্ধান, দ্বৈরথের ঘোষণা, কাপড় ধোলাই, বাজী পোড়ানো ইত্যাদি সবই থাকতো। প্রকৃতপক্ষে, সেকালের কাগজের যদি কিছু আকর্ষণ থাকে তো

সে হ'ল বিজ্ঞাপন। শুধু সেকালেই নয়, এ আকর্ষণ একালের পাঠকও অনুভব করবেন, যদি ফিরে যান সেই বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায়।

১৭৮৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর। রবার্টস নামক এক ব্যক্তি তার দ্বৈরথ—যুদ্ধের পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রাংকোর উদ্দেশে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন লিখলেন—"তোমার দেহে আমা কর্তৃক সৃষ্ট ক্ষত বিক্ষত স্থানগুলো দেখে আমার সত্যিই কষ্ট লাগছে। যাক্! রাত্রে বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার ক্ষতস্থানগুলোর প্রচণ্ড ব্যথা এবং যন্ত্রণাই তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে আমি কত শক্তিশালী !!"

১৭৮৮ সালের ৩০ অক্টোবর। পুরুষ ও মহিলাদের কেশসজ্জা করার জন্যে প্যারিস থেকে এসেছেন হেয়ার ড্রেসার মিষ্টার লাফ্রোর। তিনি একেবারে হাল-ফ্যাশানের কেশসজ্জা করেন। মহিলাদের জন্যে ৪ টাকা এবং পুরুষদের ২ টাকা। চুল-কাটার জন্যে ৮ টাকা। তৎকালীন দিনে!

১৭৯১ সালের ২৮ এপ্রিল। বহু অকেজো ঘোড়া প্রতিদিন কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় দেখে জনৈক ভদ্রলোক ইঙ্গিত হিসাবে প্রস্তাব করছেন যে, আমাদের দেশে ঘোড়া—প্রজননের কাজে এদের বেশ ভালোভাবে লাগানো যেতে পারে। বিজ্ঞাপনদাতা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ঘোড়াগুলির দেশপ্রেমী মালিকরা এই পরিকল্পনা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। ঘোড়াগুলি ধন্যবাদ সহকারে গ্রহণ করে প্রস্তাবিত কাজে ধর্মতঃ ব্যবহার করা হবে। অতএব ঘোড়ার মালিকগণ "ঘোড়া দান করুন।"

১৭৯০ সালে প্রকাশিত নীচের এই বিজ্ঞাপনটি পড়লে হাসি পায় বটে, কিন্তু সে যুগে কোম্পানী কর্মচারীদের কাছে টাকার যে কতটুকু মূল্য ছিল তা বুঝতে দেরী হয় না।

"জনৈক ভদ্রলোক পায়ের নীচে কড়া হওয়ায় বড় কষ্ট পাচ্ছেন। যিনি এই কড়া তুলে দিতে পারবেন, ভদ্রলোক যন্ত্রণামুক্ত হওয়ার পর তাঁকে ১,০০০ সিক্কা টাকা দেবেন।—জিগজ্যাগ্‌লেন।"

গেঁটে বাতের রোগীর বাতের যন্ত্রণা উপশমের জন্যে বিশেষভাবে তৈরী আরাম কেদারার এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ১৭৯৫ সালে। আসবাবপত্র নির্মাতা মিঃ ওবলিউ মায়ার্স এক বিজ্ঞাপনে জানান যে, অন্যান্য আসবাবপত্রের

সঙ্গে ছুটি মেহগিনি কাঠের মারলিন "গাউট চেয়ার" পাওয়া যাবে। চেয়ার ছুটি চামড়া, লোম দিয়ে মুড়ে একেবারে ঠিক করে রাখা হয়েছে।

১৮০৯ সাল। পাণি প্রার্থীর বিজ্ঞাপন: "ভদ্রবংশের সুন্দর যুবক সদ্বংশ অংশীদার এবং উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনীলাভে অভিলাষী হয়েও কোনও সুন্দরী যুবতীর পাণি-প্রার্থনার এই সুযোগ গ্রহণ করছেন। পাত্রীর নিজের গুণাবলী থাকা একান্ত দরকার, অবশ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হলেও আপত্তি নেই, কারণ পাত্র দূর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দীর্ঘদিন একা ভ্রমণ করতে মনস্থ করেছেন। বিয়ের পর মেয়েকে ২ বছর একাই থাকতে হবে।"

সেকালে হেয়ার—ড্রেসাররা শুধু মেয়েদেরই ফিতে ফুল দিয়ে কেশসজ্জা করতো না বা চুলে পাউডার পমেটম মাখাতো না, পুরুষদেরও কেশসজ্জা করতো। দু'বেলা ড্রেসারের কাছে চুল না বাগিয়ে কোনো সাহেবই সমাজে বেরোতেন না। ইংলণ্ড, প্যারিস থেকে নামকরা হেয়ার—ড্রেসার আসার দরুণ দেশী ড্রেসারদের সারা মাস কাজ করে দু'টাকার বেশি মিলতো না। বিদেশীদের মধ্যে আবার স্পেশাল হেয়ার ড্রেসার ছিল ফরাসীরা। ইওরোপের দু'জন বিখ্যাত ড্রেসার মিঃ মালভেইষ্ট ও মিঃ সিভেট ১৭৮৫ সালে কলকাতায় আসেন সম্ভ্রান্ত স্ত্রী পুরুষদের কেশ পরিচর্যার উদ্দেশ্যে। মালভেইষ্ট মহিলাদের কেশচর্যার জন্য মাসে তিন মোহর নিতেন আর সিভেট নিতেন সাত টাকা।

১৮১৩ সালে এক কোচোয়ান প্রদত্ত সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের ভাষাটা ছিল এইপ্রকার: "অন্যান্যরা যখন ঘণ্টায় ৬/৭ মাইল ঘোড়া চালাতে পারে, সেইস্থানে আমি বাজী ধরে ঘণ্টায় ১১/১২ মাইল ঘোড়ার গাড়ী চালাবো। হে রাজপুরুষের দল! সুতরাং আমাকে ব্যবহার করে আপনারা বৈকালিক ভ্রমণ আরো রমণীয় করে তুলুন। মাসিক বেতন—১৪০ সিক্কা টাকা।"

এই বিজ্ঞাপন-বৈচিত্রের মধ্যে আর এক ধরণের বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করা দরকার। তা হ'ল বইয়ের বিজ্ঞাপন। ১৭৮৭ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত কলকাতার নামকরা বিলিতী দোকানের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে—দোকানে চকোলেট, জ্যাম, বাদাম থেকে আরম্ভ করে Gibbon-এর ইতিহাস পর্য্যন্ত রাখা হত। এই ধরণের আর একটি বিজ্ঞাপন: মেসার্স ওয়ড্ অ্যাণ্ড নক্স-এর দোকানে সযত্নে রক্ষিত উত্তমাশার মনাক্কা ও বাদাম, স্যার হান্স্ স্লোনির মিষ্ক—চকোলেট, এণ্ডোলোর সুগন্ধি আর নতুন নতুন

বইয়ের বিরাট সমাবেশ—তার মধ্যে কয়েকটি হল : গিবনের "রোমান এম্পায়ার', জনসন এবং ষ্টিভেনসনের 'শেক্‌সপীয়র', মিউটনের "মিল্টন", চেষ্টারফিল্ডের পত্রাবলী, গোল্ডস্মিথের পত্রাবলী ইত্যাদি।

বইয়ের এত বিজ্ঞাপন দেখে প্রশ্ন জাগে, কারা এসব বই কিনতেন? যে প্রবাসী-ব্রিটিশ সমাজের অবসর বিনোদনের জন্য সুসজ্জিত গুঁড়িখানা, বিলিয়ার্ড রুম, লটারি, বাচখেলা, বারাসতের রেস, সান্ধ্যভোজ আর মনোহারী দোকানের আড্ডা—তাঁদের মধ্যেও কি এমন কিছু লোক ছিলেন—যাঁদের জন্যে ইওরোপ থেকে নতুন নতুন বই আসতো?

সে যুগের এইসব বিচিত্র বিজ্ঞাপন পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলে চলচ্চিত্রের রীলের মতো এক এক করে সেকালের প্রবাসী-ব্রিটিশ সমাজ জীবনের কত আপাত-গোপন ছবিই চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে! অজানা দেশ, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও ইংরেজ ব্যবসাদাররা কেমন করে নিরলস পরিশ্রম, সঙ্কল্প আর ধৈর্য্যগুণে এদেশে নতুন নতুন ব্যবসা খুলে প্রচুর টাকা উপার্জন করেছেন, তার কত চমকপ্রদ কাহিনীই না লুকানো আছে এই ধরণের অবজ্ঞাত বিজ্ঞাপনের অন্তরালে। এইসব ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের মধ্যে গোটা সমাজেরই বিচিত্র ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। সেকালের সংবাদপত্রের সবচেয়ে বড় বিস্ময় জমা হয়ে আছে বিজ্ঞাপনে। ঐতিহাসিক সিটন-কার সে-যুগের বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে যথার্থই লিখেছেন :…the most interesting of the whole. It throws light on the minutest detail of the inner and domestic life of the English community of Calcutta and the Bengal Presidency.

With best compliments of

SAND

B. C. KAR

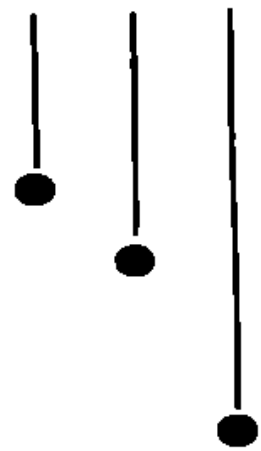

Transport & Civil Contractors.

Head Office :
8, BENTINCK STREET,
CALCUTTA.

Branch :
HALDIA
MIDNAPORE

শ্রীমলিন দত্ত কর্তৃক জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স, ৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩০/১এ কলেজ রো, কলি-৯ থেকে প্রকাশিত।

KRISHANU
Quarterly

Vol. VIII
No. II

RN 16533/68
Re. 1

with compliments of
British Paints

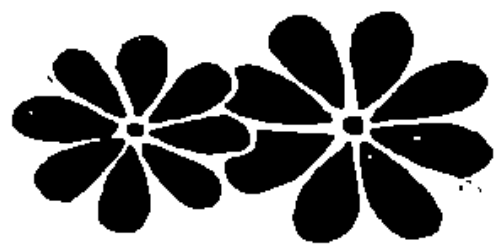

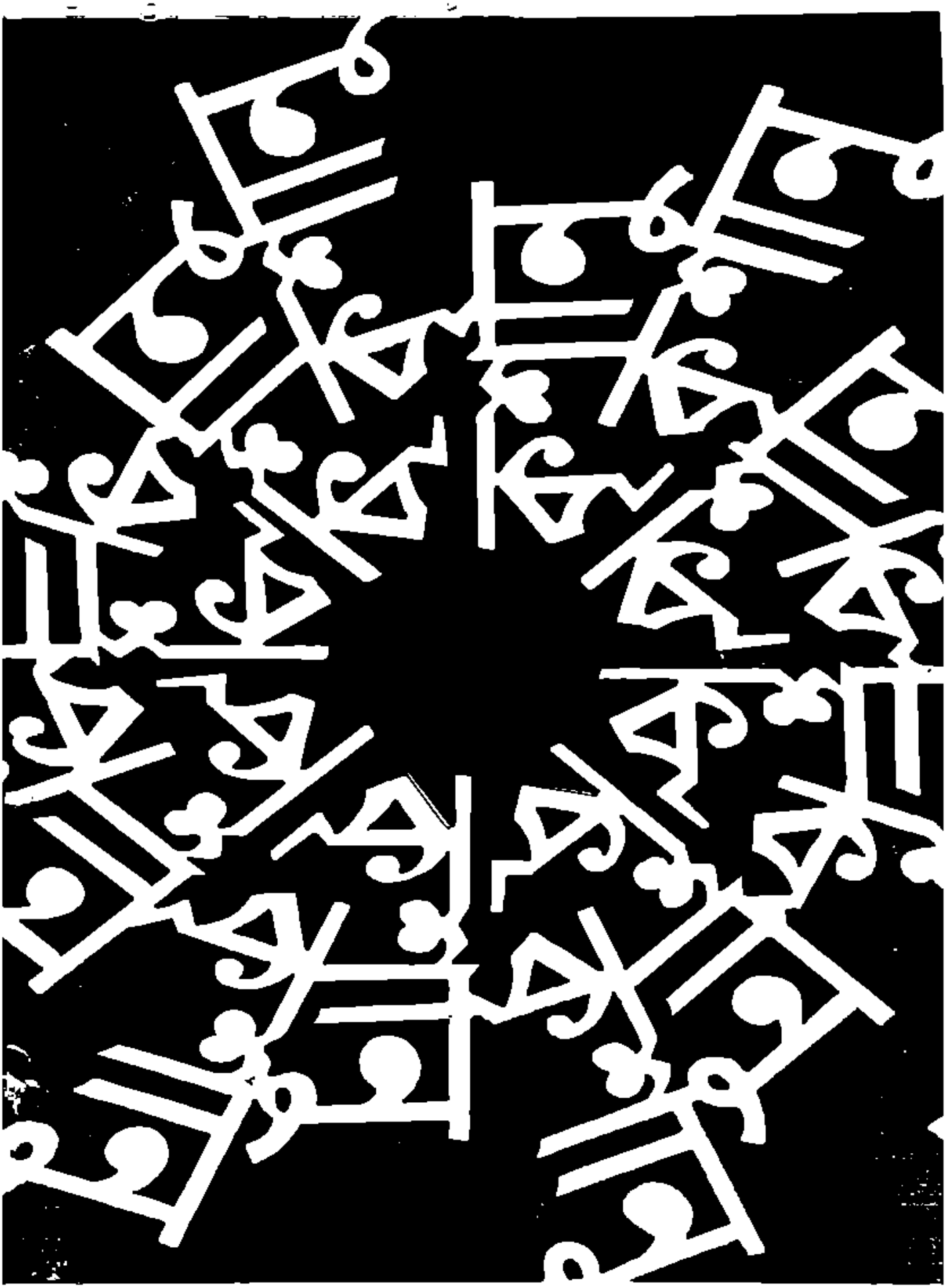

With best compliments of

DATTA ENGINEERING CORPORATION

FABRICATOR AND CONTRACTOR

25, ASUTOSH MUKHERJEE ROAD,
CALCUTTA-20.

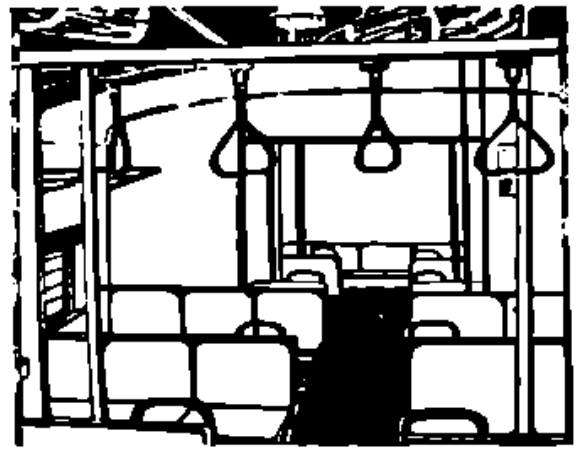

শহরতলী ট্রেন-এ ধূমপান নিষিদ্ধ

জলন্ত সিগারেট বা বিড়ি থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে ; তা ছাড়া, যাত্রীবোঝাই কামরায় ধূমপানে অন্যদের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেইজন্য শহরতলী ট্রেন-এ ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

যাত্রিসাধারণের কাছে একান্ত অনুরোধ, বাস, ট্রাম ও সিনেমা হল-এর মতো শহরতলী ট্রেন-এও তাঁরা যেন ধূমপান না করেন।

পূর্ব রেলওয়ে

কৃশানু

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) বিধির ৮নং ধারানুযায়ী বিজ্ঞপ্তি—

১। প্রকাশের স্থান—৩০।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

২। প্রকাশের কাল—ত্রৈমাসিক।

৩। প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম—শ্রীমলিন দত্ত, জাতীয়তা—ভারতীয়, ঠিকানা—রামকৃষ্ণ পল্লী, পোঃ—বাটানগর, জিলা—২৪ পরগণা।

সম্পাদকের নাম—শ্রীদীনেশচন্দ্র সিংহ, জাতীয়তা—ভারতীয়, ঠিকানা—গ্রাঃ+পোঃ—দৌলতপুর, জিলা—২৪ পরগণা।

মালিকগণের নাম ও ঠিকানা: (ক) মলিন দত্ত, রামকৃষ্ণ পল্লী, বাটানগর, ২৪ পরগণা। (খ) মদন দাশ, ৬০।২, ব্যানার্জী বাগান লেন, হাওড়া-৬ (গ) হরিপ্রসাদ ভৌমিক, ই, এইচ ১।২১, বাটানগর, ২৪ পরগণা। (ঘ) দীনেশচন্দ্র সিংহ, দৌলতপুর, ২৪ পরগণা।

আমি, শ্রীমলিন দত্ত এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ, ১৫ই মে ১৯৭৬

স্বাক্ষর—মলিন দত্ত
প্রকাশক

শারদীয় কৃশানু

গল্প কবিতা সমৃদ্ধ হয়ে
মহালয়ার পূর্বেই
প্রকাশিত হচ্ছে

গ্রীষ্মকালে শীতল আরাম

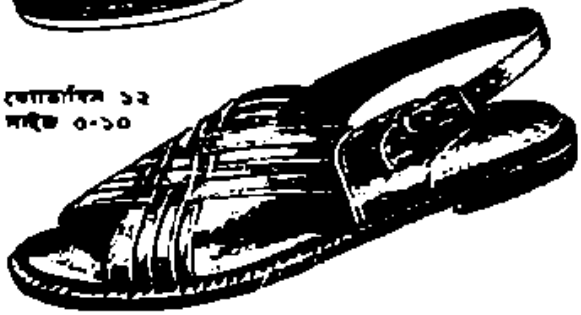

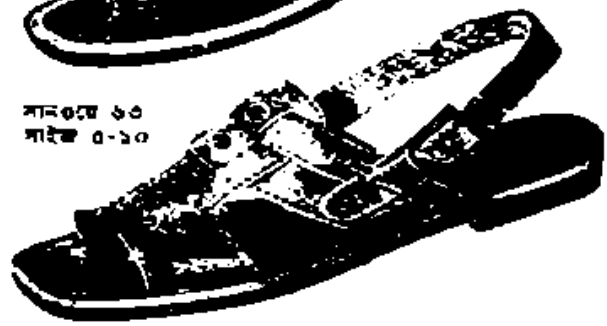

Bata

MAXIMIX

CONSTRUCTION MACHINERY

- RUGGED CONSTRUCTION
- MAXIMUM EFFICIENCY
- EASY HANDLING

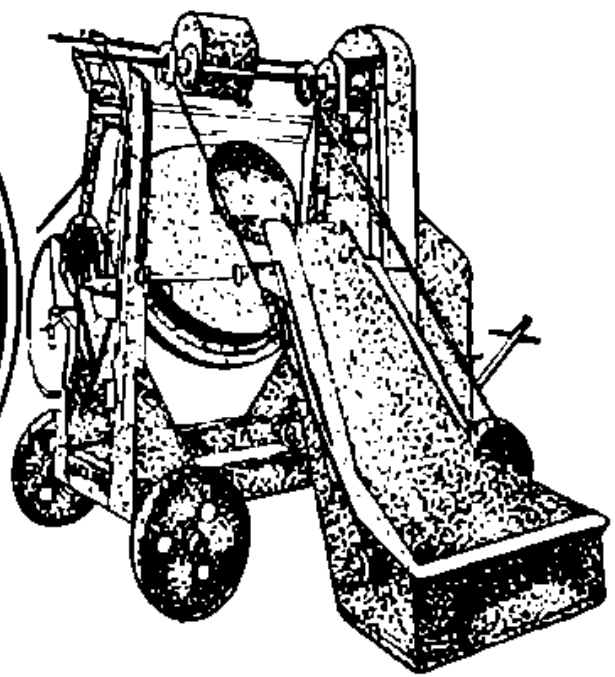

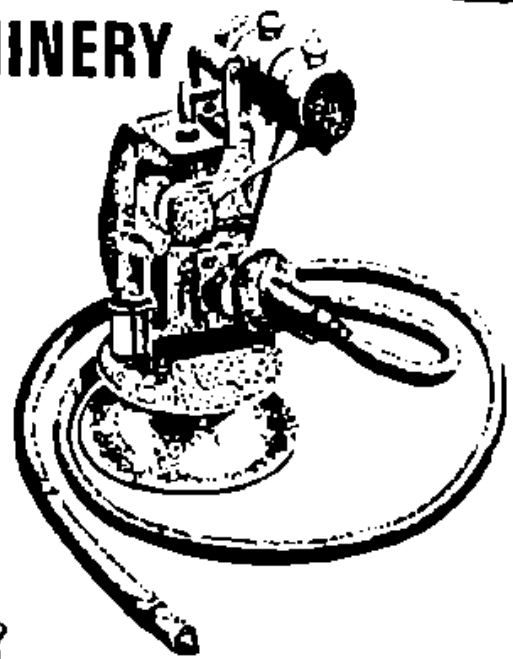

ALSO AVAILABLE INTERNATIONAL BRAND CONCRETE VIBRATORS UNDER DGS & D RATE CONTRACT

INTERNATIONAL ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.

TECC

16, BIPLABI RASHBEHARI BASU ROAD, (CANNING STREET), CALCUTTA-700001
PHONES : 22-4212/22-3595 TELEX : 021-3151 (NARAYAN) GRAM : POWERMACO

Other Maximix Products :

Vibrating Earth Rammers (Vibro-Tampers), Vibratory Road Rollers, Power Trowels

জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একসুরে বাঁধা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

কবিগান বাঙালী কৃষ্টির
অন্যতম অঙ্গ। পূর্ববঙ্গের
কবিগানের শেষ সার্থক প্রতি-
নিধি কবিয়াল শ্রীনকুলেশ্বর
সরকারের (নকুল দত্ত) প্রায়
৭০ বছর ব্যাপী কবিজীবনের
অনবদ্য আলেখ্য। খ্যাতনামা
কবিয়ালদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার
চমকপ্রদ বিবরণ। পূর্ববঙ্গের সরস মাটি ও রসিক মানুষের সাবলীল পরিচয়

প্রকাশের অপেক্ষায়

কবিয়াল কাহিনী

প্রভাস ভদ্র

নিটোল গল্প লিখনে অত্যন্ত সযত্ন। কাহিনী নির্বাচনে সংযত।
চেনার মধ্যে অচেনার
চিরাচরিতের মধ্যে চিরায়তের সন্ধানই তাঁর সংকল্প।
তাঁর কয়েকটি অসাধারণ গল্পের সংকলন

স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রকাশিত হল। দাম পাঁচ টাকা

হাতিয়া—ধুরুয়াতে টাকা উড়ছে।
কায়দা জানলে সে টাকা ধরাও যায়···
প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামে
প্রকৃতি যে হেরে যাচ্ছে তার প্রমাণ···
সুবর্ণরেখার জল এবং
বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পকে কেন্দ্র করে

জ্যোৎস্নাময় বসুর

নতুন স্বাদের প্রথম উপন্যাস

সিকিদিরি

প্রকাশিত হল। দাম সাত টাকা।

লিপিকা ৩০।১এ কলেজ রো কলিকাতা—৯

কৃশানু

মননশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক

নববর্ষ সংখ্যা

অষ্টম বর্ষ । তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা । তেরশ' তিরাশি

সূচী

গোবিন্দ ভট্টাচার্য/এমন বিরহ বেলা/সমরজিৎ সিংহ/সে আমাকে/সোমনাথ মুখোপাধ্যায়/অন্তরালে স্বর্গ/দেবাশিষ বসু/বদলে যায়/মলয় সিংহ/আমার জন্য/জয়ন্তী রায়/শুধু প্রয়োজনে/গৌতম চৌধুরী/সাম্প্রতিক পঞ্চাশ/নারায়ণ বসু/নিজস্ব সীমায়/দীপঙ্কর সাহা/ঘর/অভিজিৎ ঘোষ/জীবন যাপন/সুরজিৎ ঘোষ/হাঁটা/শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত/এবং তাপসী/নীহারিকা দেবী/চলাচল/শান্ত রায়/দু'টি কবিতা/কার্তিক মোদক/কাক/অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়/অথচ এখনো/কেশব সামন্ত/অনেক দূর/গৌতম চট্টোপাধ্যায়/নিজেকে খুঁজেই পাচ্ছি না/কাশীনাথ দাশ চাকলাদার/মধ্যরাতে/কৃষ্ণেন্দু বসু/জীবন, ভালোবাসা/স্বপন মজুমদার/ভয় হয়/তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়/আশ্চর্য প্রদীপ/দেবাশিষ বসু/কবিতা সম্পর্কিত/২১৯/বলরাম দাস/শ্রেষ্ঠ দেবদূত এবং জাম্বেলী (অনুবাদ) /২২৩/রক্তেশ্বর বর্মণ/গৌর ক্ষ্যাপা/২৩৪/দীনেশচন্দ্র সিংহ/কবি-কাহিনী/২৪১/মদন দাশ/প্রতারক/২৫৩/অজিত হাজরা/ভূষিত/২৭২/নতুন বই/২৮০

প্রচ্ছদ
শ্রীপ্রভাস

সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র সিংহ

সম্পাদকীয়

এদেশে সৃজনশীল সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের জন্য অনেকগুলি পুরস্কার পদক ও পদবী চালু আছে। দু'একটি বাদে সরকারী পর্যায় বা তহবিল থেকেই এগুলি বিতরিত। লেখকদের সামনে রয়েছে একাডেমী এওয়ার্ড এর পাকা কলার কাঁদি, জ্ঞানপীঠের পিঠ চাপড়ানি, উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিদেশী পুরস্কারের প্রলোভন। প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের পুরস্কারও কয়টা আছে। তার মূল্যমান খুব বেশী না হলেও মূল্যবান সরকারী পুরস্কার লাভের পথে সেগুলি ক্যারাক্টার সার্টিফিকেট এর কাজ করে। সুতরাং সাহিত্যোৎপাদন ক্ষেত্রে মন্দীভাব চললেও, সাহিত্যিকদের বাজারে বেশ তেজীভাবই বর্তমান।

এসব পদক পুরস্কার খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নামাঙ্কিত। তাতেই পুরস্কারের মর্যাদাবৃদ্ধি, প্রাপকদের মানবৃদ্ধি। উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত হলে দাতা ও পরামর্শ দাতাদের বিচারবুদ্ধি ও নিরপেক্ষতার উপর সাহিত্যরসিকদের আস্থাবৃদ্ধি। তার ব্যত্যয় ঘটলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের নৈতিক ও চারিত্রিক শৈথিল্যের উপর সন্দেহ স্বাভাবিক। অযোগ্যকে যোগ্যতার আসনে বসাতে, তার জন্য কৃপা ও শিরোপার ব্যবস্থা করতে অনেকেই দেখি অত্যুৎসাহী। এদের মধ্যে "দিয়ে ধন্য, পেয়ে ধন্য" গোছের চুক্তি রয়ে গেছে যেন। কিন্তু 'পাওয়া' আর 'পাইয়ে দেওয়ার' মধ্যে যে অনেকটা ফারাক!

আশি শতাংশ নিরক্ষর অধ্যুষিত দেশে লেখক-সাহিত্যিক-কবি-সাংবাদিক-অধ্যাপকগণ কিছুটা অজ্ঞতাপ্রসূত শ্রদ্ধার অধিকারী। এরা সাধারণের এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে কসুর করে না। এককালে এদের লেখনীতে দু'এক কণা শস্য ফলেছে। কৃপণের বাতাসা মিশ্রিত জলপানের মতো তা ভাঙিয়ে এরা আমৃত্যু ভালই চালিয়ে যাচ্ছেন। সভাসমিতি সম্মেলন সমাবেশে উদ্বোধক, উন্মোচক, প্রস্তাবক, সমর্থক রূপে বাঁধা পরিসর। দেশী বিদেশী নানা মাকাল প্রতিষ্ঠানের তল্পিবাহক রূপে দেশবিদেশ ভ্রমণ, নগদে বা পণ্যে কোষাগার তোষাগার ভরতি। এসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দালালরা দলবিশেষ, ব্যক্তি বিশেষ, রাষ্ট্র বিশেষের দালালী করে লাল হচ্ছে দিনে দিনে।

সম্প্রতি রবীন্দ্র পুরস্কার নিয়ে কেচ্ছাকেলেঙ্কারীর একশেষ। তার দুর্গন্ধ না কাটতেই মোটা টাকার শরৎ পুরস্কার তহবিল সৃষ্টির সংবাদ ঘোষিত। অপজন্মা সাহিত্যিকদের হেনস্তা করার জন্য তাদের নামে পুরস্কার ঘোষণা করাই বোধ হয় বিধি। চতুর্থ শ্রেণীর লেখকগণ যথাস্থানে যথাযোগ্য দ্রব্য প্রয়োগে সত্বর সামিল হোন।

এমন বিরহ বেলা

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

এখন বিরহ বেলা
যায় শ্রীঘ্র, অতি দ্রুত যায়
আষাঢ়-মেঘের শীর্ষে বিষণ্ণ অলক।
সেই বিহ্বল রেখাচিত্র ধরে
নির্বাসনে পাঠানো ক্লান্তিকে।
নোঙরে শিকলে
অতি দ্রুত খঞ্জনা বাজিয়ে
সমুদ্রে ফিরে যাচ্ছে সান্ধ্য ভাগিরথী
ভোঁ বাজিয়ে দীপ জ্বালছে বণিক জাহাজ
'যাই যাই' গেয়ে যাচ্ছে
কীর্তনীয়া হরিয়াল ঝাঁক
চিমনীর দীর্ঘশ্বাস
দ্বিখণ্ডিত করে দিচ্ছে সূর্যাস্তের বিভা।

এমন বিরহ বেলা
স্বয়ম্বরা পুব হাওয়া হেঁকে যায়
বেলফুল
নিঃসঙ্গ সৈকতে,
আর্ত ভিখারীর মতো ডুকরে ওঠে
ছিন্নভিন্ন মেঘ।

সে আমাকে

সমরজিৎ সিংহ

সে আমাকে নিয়ে যাবে দূরে, উজ্জ্বল জাহাজ তার
নোঙর ফেলেছে এই ঘাটে, আমাদের ঘরবাড়ি
হবে. সে আমাকে পোড়নীয় রোদ দেবে, শস্যের সময়ে বৃষ্টি—
তাও দেবে, মাঝে মাঝে বিরহ বিধুর রাত শরীরের থেকে দূরে গিয়ে
মাঝে মাঝে বন্যা চাই, প্লাবিত হৃদয়
সে আমাকে নিয়ে যাবে দূরে, উজ্জ্বল জাহাজে চড়ে
মনে হবে, কিছু ঋণ ছিলো, জরায়ুর কোষ ভরে
কিছু পাপ, সে আমাকে নিয়ে যাবে দূরে, সে আমাকে···

অন্তরালে ঝর্ণা

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

একটি ঝর্ণার সঙ্গে আশ্চর্য প্রণয় ছিল, তার চিহ্ন কিছু
আছে এই ক্যামেরায়, আর আছে মনের গোপনে—
চারজন যুবকের নগ্ন স্নান দেখেছে কি কেউ ?
শুধু সেই ঝর্ণা জানে, ঝর্ণা জানে যৌবনের ছবি
ঝর্ণা রাখে স্মৃতি আমাদের
আমরা শহরে ফিরি ; কাজে যাই, গল্প করি, কফিহাউসের
ভিড়ে মিশে যাই. অনেকে বোঝে না কিছু
আমাদের অন্তরালে ঝর্ণা আছে এক, স্মৃতি আছে
সে মনে রেখেছে চারজন যুবকের হাসি গান
যেন ঝর্ণার বদলে এক নারী বুঝি আমাদের প্রেমে পড়ে
অভিমানে মাথা খোঁড়ে পাথরের গায়ে
যদি কোনোদিন ফের যাই, মনে পড়ে যাবে সেই
ঝর্ণার প্রণয়-টান, কিন্তু তার কাছে কেউ হয়তো যাবোনা
যার চিহ্ন পড়ে আছে ক্যামেরায়, মনের গোপনে—

বদলে যায়

দেবাশিস বসু

এক দশকে বদলে যায় অনেক কিছুই
বদলে যায় উঠোন, পাড়া
প্রতিবেশীর খুব চেনা মুখ
ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখা
বুকের ভেতর গোপন অসুখ
ভালোবাসার ভাষা অনেক ঝকঝকে হয় এক দশকে···

ভিজে দিনে রৌদ্র ওঠে, সূর্য বলে খানিকটা শুই
মেঘের কোলে,
মেঘও ভোলে কোথায় কখন
জল ঝরাবার খুব প্রয়োজন
এক দশকে অনেক সময় একটু-আধটু ভুল হয়ে যায়
অনেক দেয়াল ভরে ওঠে
অনেক দেয়াল শব্দ হারায়।

আমার জন্য

মলয় সিংহ

অন্ধকারে ডুবুক তারা, ভাবুক আমার মতো
ইটখোলা তার বুকের ভেতর
ঘণ্টা নাড়ে সকাল দুপুর
শুন-শুকনো রোদ্দুরে সে আনন্দ কী পেতো ?
আমার জন্যে ভাতের কাঁকর
ছেঁড়া বুকে টানছে হাঁপর
বাঁচার এবং না বাঁচার এক একান্ত চপ্ ছিলো
আমার জন্যে ইস্টিশনের দুঃখ ছিলো যতো।

শুধু প্রয়োজনে

জয়ন্তী রায়

প্রয়োজনে বহু পথ ছুটে চ'লে যাই,
বহু পথ পার হ'য়ে আসি,
প্রয়োজনে বাক্য ব্যয়
সীমিত হাসির ঢেউ,
নিরর্থক দৃষ্টি বিনিময়।
অন্ধকারে আলো জ্বালি,
কালি, ধোঁয়া, পরিচ্ছন্ন প্রভাতের ঘামে—
প্রয়োজনে শুধু পরিশ্রমে
দিনান্তের নিখুঁত বিশ্বাস।
শুধু যন্ত্র হতে গিয়ে
থেমে যায় রক্তের স্রোত
স্তব্ধ হয় অনুভব শরীরের শিরায় শিরায়—
ভালবাসা নতমুখ থরথর কপোতের ডানা
ভালবাসা চড়ুই এর বন্ধহীন গাছের শাখায়।
প্রয়োজনে শুধু প্রয়োজনে
বহু পথ ছুটে চলে যাই,
প্রয়োজনে বাক্যব্যয়
সীমিত হাসির ঢেউ
নিরর্থক দৃষ্টি বিনিময়ঃ
চিরদিন রিক্ত থাকে মন,
পড়ে থাকে স্তূপীকৃত গোলাপ মুকুল
গন্ধের নির্যাসে শুধু নির্বোধ সময়
পার হ'য়ে যায়।

সাম্প্রতিক পঞ্চাশ

গৌতম চৌধুরী

এই স্থির আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আমি কত মহান হ'য়ে উঠি। নিবিড় ওষ্ঠলতা এসে ঢেকে দ্যায় অনস্তিত্বের একজোড়া সাদা পা। ছো ছো কোরে হেসে ওঠে আমার সামান্যতম অস্ত্র। প্রান্তর অতিক্রম কোরে উদাসীন সাহস চোলে যায় দূরদেশে। নদীমাতৃক সরলতায় ঝলমল কোরে ওঠে তার দরিদ্র পোষাক। আমি চোখ থেকে খুলে রাখি আমার অহঙ্কার। আর সেই প্রণত গ্রীবায় তুলে দিই আমার তীব্র ওষ্ঠপুট। এইভাবে আমাকে পেরিয়ে যায় আমার দীর্ঘ ভালোবাসা। পাথর ও বৃক্ষের কাছে আমার প্রণাম ফিরে আসে আমারই নৈপুণ্যে। এই স্থির আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে কেমন স্বচ্ছন্দে আমি পরিমাপ কোরি আমার বিপুল তুচ্ছতা। আর ক্ষমার যোগ্য হ'য়ে উঠি এই সময়ের। আর ক্ষমার যোগ্য হ'য়ে উঠি এই পৃথিবীর।

নিজস্ব স্টীমার

নারায়ণ বসু

হুইসেল বেজে উঠলে
সবাইকে ফিরে যেতে হবে নিজস্ব স্টীমারে
এই কথা বলে
সে মিশে গেল দ্রুত অন্ধকারে।

সেই থেকে ক্রমাগত ভাবছি
আমি তো কালের রাখাল
আমারো আছে নাকি নিজস্ব স্টীমার ?

ঘর
দীপঙ্কর সাহা

ভ্রমণে রমা সুখের বোধ ছিল বালিয়াড়ি থেকে—
ক্যাকটাস থেকে নয়, সরু মাছরাঙা পাখি
আজানু বিস্তৃত করে কপিল ঘরে পালিয়ে যায়।
প্রথমা রমনীর ঘুম ঘুম চোখের, এই আমি
ফাল্গুনের শেষ মালগাড়ি নিয়ে ছুটে আসি, আহা
হলুদ রোদে উত্তরীয় বেমানান হয়ে, একাকী
শৈশব, ঘাসফুলের আকাশ চুপচাপ চেয়ে থাকে।
ওই ঘর কোন পুকুরপাড়ি দুপুরে রমা মুখের
কুকুরহীন ব্যাবহার খোঁজে। মূঢ়তা ছেয়ে যায়
লোকালয় আলোকিত ব্যঞ্জনায়, আদিম আমি
ঘরছাড়া কোন বেঁবুশ ময়দানে আরো নিবিড়।

জীবন যাপন
অভিজিৎ ঘোষ

আমার সুসময় দুঃসময় বলে কিছু নেই
পাতায় ডালে জড়িয়ে থাকি সমস্তদিন
আলো, আর বেশী কিছু বাঁচবোনা,

হাঁটা

সুরজিৎ ঘোষ

একা রাতে খালি বিছানায় ভয় কেন, দ্বিধা
স্তব্ধতার সাথে পাশাপাশি শুতে।
চাদরে রক্তের দাগ যে শিশুর আগমন
কীর্তন, সে এই নহবতে উপ্ত হয়
যেন কোন পদধ্বনি।

জাগো খুব ভোরে কাগজের হকারের প্রথম
পবিত্র ছুঁয়ে চুম্বনের ফাঁক
করা ঠোঁটের আড়ালে সাদা সাদা
দাঁতের দর্শনে।

আমার যন্ত্রণা নেই হয়ে ওঠবার পথে
অথবা না হ'লে। যেন তটে
উৎসর্জন নয়, মাঝখানে গভীর
আশ্লেষ নয় কেবল শ্রবণ আর
বীক্ষণের দিগন্ত জানালা

খুলে এক দুঃখেরও আগে দেখি শান্ত
যাওয়া-আসা।

আমার বুকের শব্দ তোমার নয় পায়ে হাঁটা।

এবং তাপসী

শুচিস্মিতা দাশগুপ্ত

সব নারী ছুঁয়ে ছুয়ে যেতে, এইবার দেখো সেই নারী
উত্তাপ—হিমেল হাওয়ায় মাখনের নরম ডেলায়
সে যেন ঠিক অবার্থ ভাবে
চোখ রাখে বিষাদিত মাঠে
ঝরে যাবে বলে ভাঙেনা সে
হাসিয়ে নাচিয়ে খালি ঘাস থেকে ঘাসে···
গর্জনে সে বড়ো বিমুখ
নতশিরা আরক্ত কপাল রোঙোচুল লাজবতী নারী···
টুপটাপ শিশিরের গায়ে, মৃদুমন্দ সহজ নিঃশ্বাস
অচকিতে সেও জানে তাকে
কে তখন ডেকে নেয় কাছে
তাই নারী রেশমের শাড়ী
ছুঁড়ে ছুঁড়ে চলে নির্বাসনে
সব নারী ছুঁয়ে যেতে যেতে
অভ্রষ্ঠ হেমতীর্থে দেখো
সেই নারী বাতাসের রঙে···
ঢেলে দেয় পঞ্চতীর্থ জল।

চলাচল

নীহারিকা দেবী

সুখ যদি হয় ক্ষণস্থায়ী, দুঃখ কেন তবে
চিরস্থায়ী হবে ?
দুঃখ—পদধ্বনি শুনে সুখটুকু যায় স'রে ;
দুঃখ—মাতা এলে।
মুখে করুণ হাসি
'এবার তবে আসি'
বলে সুখ-পারাবত ওড়ে।
চলমানা এই পৃথিবী কালস্রোতে ঘোরে।
চলছে দিবারাত্রি,
জীবন-মৃত্যু চলার ছন্দে, আমরা সবাই
পথিক এবং অমৃতলোক-যাত্রী।

প্রথম বয়স জড়িয়ে পড়ে আলিঙ্গনে কৈশোরের,
কৈশোরকে হারিয়ে দিয়ে যৌবনেরি যুদ্ধজয়,
জরার মুখে করাল হাসি, যৌবনেরি পরাজয়
চলছে দিন রাত্রি,
আমরা সবাই চলার পথিক, সত্য-শিব-সুন্দরের
অমৃতলোক-যাত্রী
নিঃশ্বাসে আর প্রশ্বাসেতে চলছে ধ্বনি—ওম্
সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্ ॥

দু'টি কবিতা

শান্ত বসু

অন্ধ-সুখ

স্টিপ্লাকের দু'কাঁটায় যেন উল—আমায় নিয়েছো,
'নিয়েছো' না, নিয়েছিলে ;
ঘুমুনি কিছুটা হ'লে
অকস্মাৎ বজ্রগর্জনের শব্দ···যার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
মোহভঙ্গ করে ;
আমি দ্রুত ঘর-দোর ফুলের কেয়ারি ছেড়ে
ফুটপাথে ও পথে—।
এ' মুহূর্তে বাহু-টাহু মেলে কেন ডাকা ?
আমার বিনাশ করতে, অবলীলাক্রমে, নিজে নষ্ট হ'তে চাও
কেন ?
ধ্বংসে এতো সুখ !

বেড়ে ওঠে

রোজ সন্ধ্যেবেলা ওর মা'র ঘরে দোর বন্ধ হয়
কালও মা পিঠে হাত বুলিয়েছে :
'বাইরে খেলা করু, তোর জন্যে এনে দোবো লাটিম লজেঞ্চুস
ঘর ছাড়তে মন
চেয়ো

কে যেন বলে, এই গলির ছেলেগুলো বড্ড জ্বালাতন
করে মশায়, যতোসব রাঁড়ের বাচ্চা—!
অনেক রাতে বড়োরাস্তাও একলা হয়ে আসে, সব লোক ঘরে,
রাতের মনে রাত গভীর, তারপর ঝিকে, দিনের মনে দিন
গড়িয়ে যায়, গড়িয়ে যায়—এ'ভাবেই সে
বেড়ে ওঠে
তারপর একদিন যুবক··· ।

কাক

কার্তিক মোদক

উজ্জ্বল হলুদ রোদে চৈতি ডালে বসে থাকে একটি কাক,
দিগন্ত জুড়ে মাঠ, মাঠের ভেতর সবজী বাগান,
তার চার পাশ ঘিরে সীমানা, সীমানার ওধারে
বকুল তলার স্লুইশ গেট, কয়েকটি ঘর, নদীর বাঁক,
পাল তোলা নৌকা, শীতল বাতাসে কেঁপে ওঠে জল,
হাওয়া বেয়ে বুকে- ভরি খোলার অই ঘরভায়
পত্রহীন শূন্য ডালে একটি শিমুল যেন রাখে ফুল,
ঝুমকো জবা, ছোঁ তা বুকে,
মনে হয় তার যু উড়ে ।

অথচ এখনো

অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়

তারপর আমরা তো একদিন মরে যাবো হঠাৎই, শেষ
রাত্তিরের অন্ধকার ছুঁয়ে অবিরল বৃষ্টি নামবে আর
ভেসে যাবে আর উপচে উঠবে শহরতলির সমস্ত নালা
নর্দমা, শুধু জানলায় হাত-পা ছড়িয়ে জেগে বসে থাকবে
আমাদের মা, থুত্থুরে বুড়ি, শক্তিহীন, চলছল চোখ—
সমস্ত কিছুই এই ভাবে শেষ হয়ে যায় না হঠাৎ—গাছের
মাথায় চোখ মটকে তাকিয়ে থাকে মমতাময় শকুন
সেই জন্যেই কি আপাতত সব চুপচাপ, গাছের পাতাটি
নড়ছে না সেই জন্যেই কি আর চেয়ারের নিচে ঘুমিয়ে
আছে মহাজাগতিক বেড়াল ঘুমিয়ে আছে তার থাবার
নীচের নখ আর আমরা আঙুলের ডগায় একদিন পরখ
করে দেখব এই জীবন ভিবের ডগায় চেখে দেখব
কী রকম আশ্চর্যভাবে পরিবর্তিত হওয়ার বদলে ঈষৎ
নুয়ে পড়েছে মৃত্যুর নিশীথে—দু'পায়ে দাঁড়াবো। ভালো—
মন্দের ছায়া ও রোদ্দুর অথচ এখনো যে যেমন ভাবে
ইচ্ছে শুয়ে-ব'সে কাটিয়ে দিচ্ছে দিন—ট্রামের ঘর্ঘর
সকালে শুবরে পোকার মতো হুমড়ি খেয়ে চেটে নিচ্ছে
খবর কাগজের শুকনো পাতা, তবুও কী রকম অবিশ্বাস্য
ধমধমে ওই ওভারব্রীজ ঝিমোচ্ছে স্টেশন, রেলগাড়ির
আশায় ভিনগাঁয়ের নতুন বর-ক'নে আর ওইতো ওইদিকে
তোমার জানলায় একটা বাঁকা মাঠ একটা ফাঁকা মাঠ
অর্ধেক জেগে আছে যেন ফুটোফাটা ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে
দাঁড়িয়েছে আজন্ম কাঙাল আর ওই ওই হাড়মাস
ভাজাভাজা হয়ে গেল আমাদের ওই কোল কুঁজো কেরাণির
গরীব হাতের ওপর ফুলে উঠলো নীল রঙের শিরা—কে দেবে

সান্ত্বনা, কেউ কি ক্ষমার যোগ্য এইসব দেখে শুনে স্বপ্নতাড়িত
কুকুরও একদিন ফুটপাত ছেড়ে নেমে দাঁড়াবে রাস্তায়
অসম্ভব বেদনায় চোখ তুলে তাকাবে আকাশে—তার পাঁজরের
আড়াল থেকে বেজে উঠবে গান, মৃত্যু ক্ষমা করবে কি
তাকে সেইদিন অথবা উপহার দেবে ছাতা।

অনেক দূর

কেশব সামন্ত

দ্বি-প্রহরের বাতাস আমাকে
রমনীয় সুখের দিকে যেতে বলেছে
কিন্তু সংগী আমার ঠোঁটে বিষপাথর ছুঁইয়েছে
কাল সারাক্ষণ পাঁচিলে মাথা রেখে
রৌদ্রস্নান করেছি।
তুষের সোনালী আস্তরণে এক নীরব সভ্য
আতসবাজীর মত বিরাট শব্দ বুকে
আকাশে ফানুস
রমনীয় সুখের দিকে আমার পা রাখি
যেতে না পারলে আমার দোষ ধোয়োনা।

নিজেকে খুঁজেই পাচ্ছি না

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

কয়েক শতাব্দি আগে
আমি আকাশ দেখেছি
সারি বেঁধে উড়ে যেতে দেখেছি
মুক্ত বিহঙ্গ বহুদিন।
একটা প্রজাপতি ডানা ভাঁজ ক'রে
ব'সে আছে গাছের পাতায়
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি
বাইরে কেউ নেই,
পথিক সব গাড়ি বারান্দার নিচে
চলে যায়।
ওখানে সেই ধান ক্ষেত
একটা বুলবুলিই আলের পারে তখনও
আমি নিজেকে খুঁজেই পাচ্ছিনা।

মধ্যরাতে

কাশীনাথ দাশ চাকলাদার

মধ্যরাতে জীবনের ওপর দিয়ে অনেক
দুর্ঘটনা ঘটে যায়।
তখন বুকের মধ্যে ভাঙছে মণি হৃদপিণ্ড।
আর এমি কোরেই টুকরো—টুকরো
হয়ে কোন নদীর সাথে মিশে যায়
হয়তো বা
নির্জন কোনো গাছের ছায়ার সাথে
ঘুমের গভীরে স্বপ্ন দেখি—আর

অমি—বছরের ছ-ছ'টা ঋতু
বদল হয়ে যায় চোখের সামনে
তখন বিশল্যকরণী মুখে তুলে নেয়
অভিমানী আঙুল।
আর তখন এক একটা ঋতু ঘুমিয়ে পড়ে
ফেলে আসা ঋতুর পিছনে।
এমি ভাবে দুর্ঘটনা ঘটে যায়
মধ্যরাতে।

জীবন, ভালোবাসা

কৃষ্ণেন্দু বসু

জীবনের গভীরে দুঃখ
দুঃখের গভীরেই জীবন
ভালোবাসার গভীরে হৃদয়
হৃদয়ের গভীরেই ভালোবাসা।

ভয় হয়

স্বপন মজুমদার

শৃঙ্খল পরেছিলে
তাই, তোমার রক্তে
সার্বিক মুক্তির বিষম স্বাদ।

সূর্যের পূর্ণ মুখ দেখেছিলে
তাই, তোমার শপথগুলিতে
অসীম সাহসের বিস্ময়কর সমারোহ।

এখন সময় বড় অবিশ্বাসী
তাই, তোমার জন্য
নিরন্তর দারুণ ভয় হয়॥

আশ্চর্য্য প্রদীপ

তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই যে জীবন এক আশ্চর্য্য প্রদীপ
প্রচণ্ড ঝটিকাঘাতে দীপশিখাটুকু
বেদনায় ম্রিয়মান
প্রায় নিভু নিভু,
কখনো দ্বিগুন তেজে প্রজ্জ্বলিত হয়ে
শিখায় সাধনা চলে
জ্বলা অনির্বাণ।

এই যে জীবন এক আশ্চর্য্য প্রদীপ
কখনো জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়ে
পড়ে থাকে ডানা-ভাঙা বিহঙ্গের দেহ,
পুনরায় সব ভ্রান্তি ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে
বিপুল উদ্যমে উঠে
মেলে দেয় ডানা
অসীম দিগন্ত-বক্ষে চির চলমান।

এই যে জীবন এক আশ্চর্য্য প্রদীপ
কখনো গভীর রাত্রে ঘন অন্ধকারে
বিশাল সমুদ্র বক্ষে দিক ভ্রান্ত তরী—
ভয়ঙ্করী রাত্রির তমিস্রার শেষে
নূতন রক্তিম সূর্য্য দেয় বরাভয় ;
আলোকের ঝিলিমিলি সাগরের বুকে
গন্তব্যে পাড়ি দেয় মুক্ত জল-যান।

এই যে জীবন এক আশ্চর্য্য প্রদীপ।।

কবিতা সম্পর্কিত

(এক)

বেলাল চৌধুরী একজন বোহেমিয়ান কবি। তাঁর ছন্নছাড়া জীবনের মতোই তাঁর কবিতা লেখাও অনিয়মিত—কোনো সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা সেখানে কাজ করে না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই কবির এককালীন অনুপস্থিতিকে তাই মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না, তবু তাঁর হঠাৎ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাবার জন্যে আমরা, অর্থাৎ পাঠকরা, সব সময়েই উন্মুখ হয়ে থাকি। 'বেলাল চৌধুরী কবিতা'—এই বইটিতে তাঁর গৌরবময় প্রত্যাবর্তনের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে।

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় কৃত মনোরম প্রচ্ছদের আড়ালে বত্রিশ পৃষ্ঠা জুড়ে যে-বেলাল উপস্থিত, কী করে তাঁকে ছন্নছাড়া উদাসীন বলবো? বরং এখানে তাঁর অন্য মনের সন্ধান মেলে, যে-মন ভোলে না কিছুই—ফিরে আসতে চায়, শুধু বারবার ফিরে আসতে চায় : 'চকিত দেখা কোনো দৃশ্যের টুকিটাকি/ আমাদের চোখে লেগে থাকে বহুদিন/ভুলে যেতে চাইলেও ভোলা ভার/উঠে আসে সহসা তারা ভেসে ওঠে চলচ্ছবির মতো'।

বেলালের বুকে আছে প্রেম, আছে দুঃখ বোধ এবং ভয়, হাহাকারও আছে : 'কতকাল দেখা হয়নি—হায় কতকাল' প্রথম ছত্রে যে আর্তি তার শেষ কিন্তু মেনে নেয়ার মধ্যেই : 'সুখেই থাকো ভুলেই থাকো এমনি ভাবেই/ বছর গড়ার সময় কাটে জীবন ফুরোয়' (নীল বিষাদ)। অবশ্য সব কিছুই তিনি মেনে নেননি। তাঁর পক্ষে সম্ভবও নয়। সেখানে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা, ভয়ংকর ও আপোষহীন।

'আমি ঠোঁটে দাঁতে চেপে ধরবো কাটবো
তোমার ক্লীব শব্দের শরীর এবার ভাঙবো
ক্ষীণ কিটদেশ জড়িয়ে রবে আর আশ্রয় চাইনা
করুণা দয়া ক্ষমাভিক্ষা এ-সব আর নয়
স্পষ্ট এবার তোমাকে চাই…'

নিজের দাবি জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন তিনি, তা না-হলে ছিনিয়ে নেবেন জোর করে, 'করুণা দয়া ক্ষমাভিক্ষা'র প্রশ্নই ওঠেনা।

না-পাওয়া কিংবা পেয়ে হারানোর যে দুঃখ, কখনো তার থেকে জন্ম নেয় নিঃসঙ্গতা-বোধ, এবং সেই বোধ থেকে জন্ম নেয় আরেক উপলব্ধি 'এক জীবন থেকে অন্য জীবনের ঘুণধরা চৌকাঠ মাড়িয়ে উত্তরণের গভীর অন্ধকার ঘন হয় হিমকুয়াশার ঢাকা আমার নক্ষত্র সাথ হে মহাপৃথিবী'

এরকম আরো বহু কবিতা থেকেই উদ্ধৃতি দেয়া যায় এবং আরো অনেক কিছু বললেও বইটি সম্পর্কে কিছুটা বলা হয় না বস্তুত। অধিকাংশ কবিতাই আমার ভালো লেগেছে, কয়েকটি কবিতা বেজে উঠেছে গানের মতো। কবির অসহায়তা, আর্তি, ক্ষোভ, ভালবাসা—এসবের সঙ্গে কত সহজেই একাত্মতা ঘ'টে যায়। এই কাব্যগ্রন্থ বেলাল চৌধুরীর আত্ম-উন্মোচনের চমৎকার এক দলিল, সেই শব্দে এক সার্থক উত্তরণ।

দেবাশিস বসু

বেলাল চৌধুরীর কবিতা। বিশ্বজ্ঞান, কল-৯। দাম : আড়াই টাকা।

(দুই)

'নৈঃশব্দের অনুভব' এই কাব্যগ্রন্থের কবি নির্মল বসাক একই সাথে দুঃখী, প্রেমিক, অভিমানী এবং রাগী। একজন পাঠক খুব সহজেই চিনে নিতে পারেন এই কবিকে, আবিষ্কার ক'রে নিতে পারেন তাঁর দুঃখ, প্রেম, অভিমান এবং ক্রোধ—কেননা তাঁর কবিতায় কোনো জটিলতা নেই। যদিও কৃত্রিমতা আছে। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

বড়ো, মাঝারি এবং ছোটো—এই তিন ধরণের কবিতার মধ্যে আমার ভালো লেগেছে তাঁর কিছু ছোটো কবিতা, যেমন 'প্রতীক্ষা', 'এক বুক শব্দ নিয়ে' এবং আংশিকভাবে 'জীবনানন্দ দিয়েছিলো' ও 'একটি মানপত্র'। এইসব কবিতায় গোটা ব্যাপারটাই ধরা দিয়েছে সাবলীলভাবে, জোর ক'রে টেনে আনা হয়নি কিছুই। কোথাও নেই যোগসূত্রহীনতা কিংবা এমন কোনো কিছু যা অগভীর। ফলে, শূন্যে ছেড়ে দিলে বাতাস কেটে নিজের পথ গ'ড়ে নিয়ে অবলীলায় সে এগিয়ে যায়, যেতে পারে। এখানে আমি 'প্রতীক্ষা' কবিতার শেষ তিনটি লাইন উদ্ধার করতে প্রলুব্ধ হচ্ছি—

এখনো এল না সৃষ্টি শর্তহীন এই করতলে—
নীলগন্ধ মাখা বুক
হে সমুদ্র, সমুদ্র আমার

অন্যান্য ভালো-লাগা কবিতাগুলোর আংশিক উদ্ধৃতি দেয়াও যেতো, কিন্তু সেই প্রয়াস থেকে আপাতত আমি নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে চাই। বরং ফিরে যেতে চাই আলোচনার একেবারে গোড়ার অংশে, যেখানে বলেছিলাম তাঁর কবিতায় কোনো জটিলতা নেই। জটিলতা না থাকলেও যে জিনিষটি আছে, তার নাম কৃত্রিমতা, এবং এটি ভয়ংকর। এই কৃত্রিমতার ছাপ রয়েছে তাঁর পনের পৃষ্ঠা ব্যাপী নাম-কবিতায় এবং আরো কিছু মাঝারি আকারের কবিতাতেও। নাম-কবিতাটি আরো স্বল্প পরিসরে ঘনবিন্যস্ত সুন্দর হ'তে পারতো, কিন্তু পনের পৃষ্ঠা ধ'রে তিনি সমানে সুতো ছেড়ে গিয়েছেন, গতিপথ ঠিক না-করেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুচ্চমকের মতো তীব্র, তীক্ষ্ণ, অমোঘ একেকটি লাইন এবং তার ঠিক পরের লাইন কী ভয়ানক শিথিল, বিপরীত-মুখী, অসংযত। যেমন :

আমি তো রয়েছি ঘুমে ধূসর শরীরে নিরন্তর
ঝেড়ে পুছে রাখি যেন কীটদষ্ট আমার পুস্তক
বুঝে গেছি দুরোজা বদল খেলা হয়ে গেছে শেষ
তোমারও পরাভব আজ এই উত্তরাধিকারে
রাধিকারে ফিরে যেতে হবে ফের
নীল যমুনার ততোধিক নির্জন প্রহরে
(নৈঃশব্দের অনুভব)

এখানে 'উত্তরাধিকারে' এবং তার ঠিক পরেই 'রাধিকারে' এই চটুল শব্দ-ব্যবহার লেখকের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে?

মনে রাখা ভালো কিছু অর্থহীন শব্দ দিয়ে গঠিত ততোধিক অর্থহীন বাক্য পরপর সাজিয়ে দিলেই তা কবিতা হয় না। কবিতায় চালাকি করার ব্যাপারটা তো আরো বাজে। অথচ এই রকমের চালাকি এই বইয়ের অনেক জায়গায় :

অনেক পালের খোলা পিতৃপুরুষের দেনা রেখে
কারেমী আলোর মালা দেয়ালে দুলিয়ে
ধারালো ব্লেডের মত কৌমার্যের হাসি হেসেছিল
(তবু এই উত্তরাধিকার)

নির্মল বসাক যেমন কবিতা তিল তিল ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারেন, আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মেরে ফেলতেও পারেন তাঁর কবিতাকে তেমনি সহজে।

'হৃদয়ে এক পাখি ছিল—হলুদ এক পাখি :

এই সহজ সরল সুন্দর লাইনটির পরে তিনি কোনো কিছু না ভেবেই লিখে বসেন

'ভেবেছিলাম, কুটুম আর বলে সে ডাকবে—
আর আনন্দের হাট বসবে আমার উঠোনে :'

সর্বত্রই ছন্দ ও মাত্রা জ্ঞান নিখুঁত নয়। দাঁড়ি, কমা—এগুলোকে যেন ইচ্ছে ক'রে নির্বাসন দিয়েছেন। এই সব বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে যে কবিতা-গুলো মন কেড়ে নেয়, মুষ্টিমেয় সেই ক'টি কবিতাই কেবল চৌষট্টি পৃষ্ঠার এই বইটির সম্পদ।

দেবাশিস বসু

নৈঃশব্দের অনুভব। নির্মল বসাক। বাসন্তী লাইব্রেরী, কল-৬। দাম চার টাকা।

শ্রেষ্ঠ দেবদূত এবং জাম্বেসী

মুরিয়েল স্পার্ক

অনুবাদ—বলরাম দাস

['দি গো এ্যাওয়ে বার্ড এণ্ড আদার্স ষ্টোরিজ্' বই থেকে এ গল্পটি অনূদিত। এই বইটির অধিকাংশ গল্পই আফ্রিকার পটভূমিকায় লেখা—এ গল্পটিও। কিছুটা রূপকথার ছোঁয়া গল্পটির বিশেষত্ব। লেখিকার ধর্মীয় বিশ্বাসও গল্পটিতে ধরা পড়েছে।

'দি কমফর্টার্স' তাঁর প্রথম উপন্যাস—প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। এর আগে ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল।

মুরিয়েল স্পার্ক এডিনবার্গে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করেন এখানেই। এরপর কয়েক বৎসর তিনি মধ্য আফ্রিকায় ছিলেন। বৃটেনে ফিরে আসেন যুদ্ধের সময় এবং বিদেশী অফিসের পলিটিক্যাল ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে কাজ নেন। তিনি দুটি কবিতার পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তাঁর একটি কবিতার বইও আছে। তাঁর প্রকাশিত রচনার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর নামকরা ব্যক্তিদের জীবনচরিত উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ সালে মিসেস্ স্পার্ক রোমান ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি পুত্রসন্তানের জননী।

এই বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বইগুলি কমফর্টার্স (১৯৫৭), রবিনসন (১৯৫৮), মিমেন্ট মোরী (১৯১৮) বালেড অব পেকহাম রাই (১৯৬০), দি ব্যাচেলরস (১৯৬০), ভয়েস এ্যাট প্লে (১৯৬১), দি প্রাইম অব মিস জিন ব্রোডী (১৯৬১), দি গার্লস অব স্লেণ্ডার মিনস্ (১৯৬৩) ইত্যাদি।

তাঁর রচিত নাটক 'ডক্টরস অব ফিলজফি' ১৯৫২ সালে লণ্ডনে মঞ্চস্থ হয় এবং মুদ্রিত হয় ১৯৬৩ সালে।]

আধা কবি, আধা জার্ণালিস্ট শ্যামুয়েল ক্র্যামারের নাম আপনারা হয়ত শুনেছেন। সে ফানফারলো নামে এক নর্তকীর সঙ্গে থাকতো। অবশ্য যদি না শুনে থাকেন, তেমন ক্ষতি নেই। শোনা যায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্যারিসে সে বেশ সচ্ছন্দেই কাটাচ্ছিলো। ১৯৪৬ সালে যখন আমার সঙ্গে তার দেখা হয় তখনও তার বেশ ভালই চলছিল। লোক সেই একই, তবে চেহারা পরিবর্তিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শতাধিক বৎসর বা কয়েকযুগ ধরে ক্র্যামার পঁচিশ বৎসরের যুবকটি থাকতে চেয়েছিলো কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় তার বয়স বাহান্ন বৎসরের এদিক ওদিক।

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের কাছে গিরিপৃষ্ঠের উপর যেখানে জাম্বেসী নদী সশব্দে হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার প্রায় চার মাইল দক্ষিণে ক্র্যামার

সেই সময়ে একটা পেট্রোল পাম্প চালাচ্ছিল। ক্রামারের কয়েকটি বাড়তি ঘর ছিল। জলপ্রপাত দেখতে এসে যারা হোটেলে জায়গা পেত না তাদেরকে সে ঐ ঘরগুলোতে থাকতে দিত। ক্রীষ্টমাস ডে. হোটেলে তিলধারণের জায়গা নেই; সুতরাং আমাকে ক্রামারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। গিয়ে দেখি, ঢেউ খেলানো টিন দিয়ে ছাওয়া একটা গ্যারেজের বাইরে সে তখন বিরাট, পিণ্ডির মত একটা মারসিডিস্ গাড়ীর স্টার্টার চালু করতে চেষ্টা করছে। প্রথম দর্শনেই আমার মনে হল সে একজন কঙ্গোর বেলজিয়ান। তার চেহারায় ছিল উত্তর ও দক্ষিণের ছাপ, চুল পাতলা এবং গায়ের রঙ পাঁশুটে। যাই হোক্, পরে সে আমায় বলে যে তার বাবা জার্মান ও মা চিলির অধিবাসী। তার দরজার শিরোভাগে লেখা 'S. Cramer' নামটির চেয়ে তার এই সংবাদ শুনে আমার মনে হল যে আমি তার কথা আগে শুনেছি।

বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম হওয়ার দরুন ডিসেম্বর মাসটা ছিল গরমে গরম। ক্রীষ্টমাসের আগের তৃতীয় রাত্রিতে আমি আমার ঘরের সামনে ঘেরা বারান্দায় বসেছিলাম আর ভাঙ্গা মশারীর মত জালের ভেতর দিয়ে দূরের আলোর দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়েছিলাম। যখন কোন জায়গার আবহাওয়া দীর্ঘ সময় ধরে খুব গরম থাকে তখন মনে হয় যেন জীবনের স্বাভাবিক শব্দগুলোর কিছু পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। শব্দগুলো নিজেরাই নিজেদের সঠিক পরিমাপ বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়, মনে হয় যেন চাপা ও রুদ্ধ। ক্রীষ্ট-মাসের সময়ে যে সমস্ত পোকাগুলি প্রত্যেক বারান্দায় ঠক্ ঠক্ শব্দ করে উপুড় হয়ে পড়ে—সেই রাত্রে তাদের পতনের শব্দগুলিও ছিল পরিশোধিত। আমি তাদের একটাকে পড়তে দেখলাম কিন্তু তার পতনের শব্দ একটু দেরীতে আমার কানে এসে পৌঁছালো। ঝোপঝাড়ের ছোট ছোট জন্তুদের কোলাহলও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঝোপের আওয়াজ সম্পূর্ণ না থামা পর্যন্ত—চিতাবাঘ কাছাকাছি থাকলে অমনটি হয়—আমি বুঝতেই পারিনি যে আদৌ সেখানে কোনরকম আওয়াজ হচ্ছিল কি না।

এই অস্ফুটধ্বনিগুলির উপর দিয়ে ক্রামার সান্ধ্যভ্রমণকারীদের সঙ্গে আমার ঘেরা বারান্দার পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। প্রখর তাপ প্রতিটি শব্দকে বিকৃত করে দিয়েছে। গ্লাসে একটা ঝঙ্কার উঠল কিন্তু সে যেন কাঁচের শব্দ নয়—যেন ঘুড়ির কাগজের মত পাতলা কাগজে মোড়া কোন বোতলের

শব্দ। মাঝে মাঝে, মুহূর্তের জন্য পাখীর তীক্ষ্ণ ডাক বা হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক ধ্বনি অসাড়ভাবে উপরে দুলতে দুলতে অন্য আর এক ধ্বনিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল। যেন কোন এক দূর দেশ থেকে তাদের ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে, যেন লণ্ডনের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে পকেট টর্চের ক্ষীণ আলো।

ক্র্যামার কি মনে করে আমার বেয়ারা বারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল। আমাকে তার দলের সঙ্গে যোগ দিতে বলল। আমি বললাম যে আমি খুশিই হয়েছি তার এই আমন্ত্রণে এবং কথায় কথায় এটাও বুঝিয়ে দিলাম যে আমি এখানে একা একা বসে থাকাতেই বেশী আনন্দলাভ করছি। তাছাড়া অপরিবর্তিত ও অপরিমিত তাপ আমার ইচ্ছাকে একেবারে শুষে নিয়েছে।

ওদিকে পাঁচজন লোক বেতের হাতলওলা চেয়ারে বসে বসে 'হাইবল' পান করছিল আর তার সঙ্গে মুনে ভেজানো 'পি-নাট' চিবোচ্ছিল। ক্র্যামারের দুজন ভাড়াটে—Bulawayo এর এক তামাক চাষী ও তার স্ত্রী, আর একজন মাথায় লাল চুলে ভরা লিভিংস্টোনে থেকে আগত অস্ত্রোপচারী সৈনিককে আমি চিনতে পারলাম। অপর দুজনের নামের প্রথম অংশটা আমাকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, এরা হল ম্যানি ও ফ্যানি, একজন পুরুষ, অপরজন নারী। ম্যানি লোকটা ছোটখাটো, কালো, মুখটা তার চৌকো, দেহের গঠন বেশ মজবুত। সম্ভবতঃ সে পূর্ব উপকূলের কোন পর্তুগীজ হবে। ফ্যানি অল্প অল্প পরিমান 'পি-নাট' তুলে নিচ্ছিল, গ্লাস তোলবার সময় তার হাত একটু একটু কাঁপছিল, সেই কাঁপুনির ফলে তার হাতের কিঙ্কিনী ঝিনিঝিনি শব্দ তুলছিল। ফ্যানির বয়স প্রায় পঞ্চাশ কিন্তু তবুও সে অধিক যত্নশীল ও পরিচ্ছন্ন মহিলা, তার ধূসর ও নীলাভ রঙের চুলগুলিকে সে অলঙ্কার দিয়ে দিয়ে বেশ পরিপাটি করে বেঁধেছিল। তার মুখটা শুকনো শুকনো কোঁচকানো, ঠিক ম্যালেরিয়া হলে যেমনটি দেখায়।

সেই পল্লী অঞ্চলে উপস্থিত আগন্তুকদের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য আমি প্রথমে বুলাওয়ের সেই তামাক চাষীটির সঙ্গে আমরা যেখানে বসেছিলাম তার দশ মাইল ব্যাসার্ধে বসবাসকারী পরিচিত ব্যক্তিদের নাম বিনিময় করে নিলাম। তারপর যারা আমাদের উভয়ের কাছে পরিচিত তাদের নামগুলো বেছে নিয়ে নামের তালিকাটি সংক্ষিপ্ত করে নিলাম। অস্ত্রোপচারী সৈনিকটি লিভিংস্টোন ও লুসাকার মধ্যেকার অঞ্চলগুলির কিছু সংবাদ শোনাল। ইতিমধ্যে হয়েছে কি ক্র্যামার ফ্যানি ও ম্যানির মধ্যে একটা তর্ক বেশ জোরদার

হয়ে উঠেছে। তবে ফ্যানিই সবচেয়ে বেশী তর্ক করছিল। ওদের বাক্‌বিতণ্ডা শুনে মনে হল ভগবান যীশুর জন্মদিন উপলক্ষে হয়ত কোথাও কোনো নাটক বা ঐকতান সঙ্গীতানুষ্ঠান হচ্ছে যে অনুষ্ঠানে ওরা অংশগ্রহণ করবে। ওদের তর্কের মধ্যে 'দেবদূতের দল' 'মেষপালকেরা' 'আমার মেয়েরা' 'সৃষ্টিছাড়া দাম' এই কথাগুলিই ছিল প্রধান ; কারণ এই শব্দগুলিই আমি বার বার শুনতে পাচ্ছিলাম। সৈনিকটার মুখে একটি নাম শুনেই ফ্যানি আচমকা কথা বন্ধ করে দিল. সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল :

—'সে আমারই মেয়েদের একজন। আমি তাকে ঝাড়া তিনটি বছর শিক্ষা দিয়েছি।'

ম্যানি চলে যাওয়ার জন্য উঠল। ফ্যানি তার সঙ্গে যাবার আগে তার হাতব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে আমার দিকে মেলে ধরে অস্পষ্টভাবে বলল :

—'যদি আপনার কোন বন্ধু উৎসাহী হন……।'

—আমি কার্ডটা পড়লাম

Mme La Fanfarlo (Paris, London)
Dancing instructress, Ballet, Ballroom
Transport provided by arrangement.

তারপরদিন ক্র্যামারের সঙ্গে আমার যখন দেখা হলো তখনও সে মারসিডিস গাড়াটার অসুখের কারণ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছিল।

—'আপনি কি সেই লোক—'বুদলেয়ার যার সম্বন্ধে লিখেছেন ? জিজ্ঞাসা করলাম।

আমার পেছনে খোলা জনহীন তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের দিকে সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে উদাসভাবে তাকিয়ে রইল।

—'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি ভাবে জানলেন ?' সে বলল।

—'ফ্যানির কার্ডের উপর ফ্যানফারলো নামটার জন্য, প্যারিসের সেই মহিলাকে আপনি চেনেন না ?' আমি বললাম।

ক্র্যামার বলল : 'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু সে সব দিন ত অতীতে মিশে গিয়েছে, ম্যাদুয়েলা ডি মন্টারডি মানে ঐ যে ম্যানিকে দেখলেন—সে ওকে বিয়ে করেছে, প্রায় কুড়ি বছর ধরে ওরা এখানকার বাসিন্দা। ম্যানি এখন একটা দোকান তত্ত্বাবধান করে।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কি সাহিত্য কর্ম ছেড়ে দিয়েছেন ?

—'হ্যাঁ, কর্ম হিসাবে এটা হল এক বদ্ধ সংস্কার, মানে এটা এমন এক চিন্তা যেটা মনের সব জায়গাটুকু দখল করে নেয়। আমি এই অবস্থার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে খুশী হয়েছি'—আমার প্রশ্নের সে উত্তর দিল। মারসিডিস্ গাড়ীটার বনেটের উপর হাত বুলোতে বুলোতে তারপর আবার বলল :—'সবচেয়ে ভাল সাহিত্য হল সেই সাহিত্য যা—ঘটনাক্রমে উপস্থিত হয়।' আবার সে অনিমেষ নয়নে সেই সীমাহীন তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রইল যেখানে অলক্ষিত এক ধূসর বর্ণের ঝুঁটিওলা লোউরি পাখী পিপ্ পিপ্ শব্দে ডাকছিল।

—'জীবন এক গুরুত্বপূর্ণ বস্তু'—ক্র্যামার বলে চলল।

—'আপনি তাহলে মাঝে মধ্যে কবিতা লেখেন ?' আমি বললাম।

—'যখন কোন ঘটনা নাড়া দেয়,' ক্র্যামার বলল। সবে মাত্র আমি একটা 'নেটিভিটি ম্যাস্ক লিখেছি। প্রভু যীশুর জন্মদিনে আমরা ওটা ওখানে মঞ্চস্থ করব।'

সে তার গ্যারেজের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। ওখানে ইতিমধ্যে কয়েকজন স্থানীয় লোক পেট্রোলের টিন, টায়ার ইত্যাদি অন্যত্র সরিয়ে রাখছিল। এরা নাটকের কুশীলবও নয় আর দর্শকও নয় তবুও তারা তাদের নিজেদের সময় এখানে ব্যয় করছিল। এককাঁড়ি ভাঁজকরা বসবার আসন একপাশে স্তূপীকৃত করে রাখা রয়েছে।

খ্রীষ্টের জন্মউৎসবের দিন সকালবেলা গ্যারেজের বাইরে স্থানীয় লোক-দের ঝগড়া করতে দেখে আমি জলপ্রপাতের ধার থেকে ফিরে এলাম। ওদের মাঝখানে দেখি ক্র্যামার ভারী ও উঁচুস্বরে ঈশ্বরের নামে দিব্য করছে। এক হাতে সে এক একগুঁয়ে লোকের জামার হাতা ধরে আছে আর অপর হাতটা নেড়ে নেড়ে সেই তপ্ত বাতাসের মধ্যে সে তার অপবাদের বিবরণ দিচ্ছে। নাটকের কাজে জড়িত কিছু সংখ্যক লোককে মঞ্চ বাঁধার কাজে হাত লাগাতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এদের মুখগুলো ফ্যাকাশে, পরনে এদের ড্রিল করার হাফপ্যান্ট। এরা করছিল কি এদের তৃতীয় শ্রেণীর স্কুল ইংরেজিতে ক্র্যামারের অপক. অনভিজ্ঞ, জীর্ণ পোষাক পরিহিত গ্যারেজের ছেলেগুলোকে 'রাগাবার-জন্য-না-রাগিয়ে' রাগিয়ে তুলছিল। যে বাক্যে

'পুলিশ' শব্দটি থাকে, এমন মুহূর্তে ক্র্যামার সাধারণতঃ সেই রকম বাক্য উচ্চারণ করে। তার এই বিশেষ শব্দ যুক্ত বাক্য খুবই ফলপ্রসূ। ক্র্যামার 'পুলিশ' কথাটি বলল, কেউ কোনো কথা না বলে হাঁড়ির মত মুখ করে, একে অপরের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করতে করতে কাজে ফিরে এল। শব্দটি ক্র্যামারের চরম হাতিয়ার।

আড়াআড়িভাবে পেরেক মারা চওড়া চওড়া তক্তা দিয়ে তৈরী প্যাকিং বাক্স দিয়ে বাড়ীটার পেছনে মঞ্চ নির্মাণ করা হচ্ছে। এখানকার একটা দরজা দিয়ে উঠানে, শৌচাগারে ও ক্র্যামারের জাতভাইদের কুঠিরে যাওয়া যায়। মঞ্চ ও দরজার মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটা কালো রঙের সরকারী কম্বল ঝুলিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ এটাই সাজঘর হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আমি সন্ধ্যাবেলা এসে আলো সাজানো, সাজসজ্জা, দেবদূতদের পিঠে ডানা বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি কাজে সাহায্য করবার জন্য রাজী হলাম। ফ্যানফারলোর নাচের দলের ছাত্রছাত্রীরা নাচ ও ঐকতান সঙ্গীতের মাধ্যমে 'দেবদূতের গান' পরিবেশন করবে এবং সে নিজে 'কুমারীর' ভূমিকায় ব্যালে নাচবে। তার বাবা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজী বলেন বলে মেষপালকের একটা ছোট, প্রায় মৌন থাকার অভিনয় করতে দেওয়া হয়েছে। ঐ একই কারণেই অন্য তিনজন অভিনেতাকে মেষপালকের অভিনয় করার জন্য মনোনীত করা হয়েছে। 'সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর দেবদূতের' ভূমিকাটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটানা অনেকটা কথা এই চরিত্রের মুখে আছে। 'ম্যাক্ট'টি ক্র্যামার লিখেছে সুতরাং ক্র্যামারই ঐ দীর্ঘস্থায়ী সংলাপগুলো ভালভাবে বলতে পারবে—এইজন্য তাকেই 'সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর দেবদূতে'র ভূমিকাটি দেওয়া হয়েছিল। অভিনয় আটটায় শুরু হওয়ার কথা। তখন সাতটা পনের। আমি মঞ্চের পিছন দিকটায় গেলাম। আলো আঁধারের মাঝে পাতলা কাগজ দিয়ে তৈরী ডানা আর ব্যালে নৃত্যের পোষাক পরে সমবেত দেবদূতের দল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্যানফারলোও সেখানে উপস্থিত। তার পরনে ছিল সাদা রঙের লম্বা, অতি পাতলা পোষাক। 'জ্ঞানী লোকদের' দাড়ি আটকানোর কাজে সহায়তা করছি এমন সময় ক্র্যামারকে দেখলাম। প্রাচীন রোমানরা যে ধরণের গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করতেন সে ধরনের মশারির কাপড় দিয়ে তৈরী একটা পোষাক তার পরনে ছিল। পোষাকটা যথেষ্ট মোটা না হওয়ায় তার ভেতরকার হাফপ্যান্টটা পরিষ্কার ভাবে উপর দিয়ে

ফুটে উঠছিল। আগেভাগেই সে মেক্ আপ নিয়েছিল। প্রচণ্ড গরম তার মেক্ আপ গলিয়ে দিচ্ছিল।

—'আমি বরং আমার প্রথম দৃশ্যের সংলাপগুলো একটু আওড়ে নিই. রকম অবস্থাতে আমি সর্বদাই মনে মনে বেশ জোর পাই'। ক্র্যামার বলল। মকে উঠে সে সংলাপগুলো আওড়াতে শুরু করে দিল। কৌতূহলী বাল-খিলাদের চেঁচামেচির ভিতর দিয়ে তার আবৃত্তির ছন্দটুকু শুধু আমার কানে ভেসে এল। মেয়েদের মেক্আপের নানা কাজে সাহায্য করতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল। রঙের তুলি তুলব কি, তোলার সঙ্গে সঙ্গেই রঙ গলে জল হয়ে যাচ্ছে সত্যিই অস্বাভাবিক গরম পড়েছিল সেদিন।

ফ্যানফারলো চিৎকার করে বলল 'দরজা খোলো'। পিছনের দরজাটা খুলে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী জনতা প্রবেশ পথটাকে চতুর্দিক থেকে চেপে ধরল। আমি সব ছেড়ে ছুড়ে দিলাম। বাড়ীর বাইরে আমাকে যেতেই হবে। একটু ঠাণ্ডা বাতাস আমার চাই-ই। মঞ্চের ওপারে যাচ্ছি এমন সময় একটা প্রচণ্ড গরমের ঝলকানি অনুভব করলাম। চতুর্দিকে তাকালাম, দেখি ঠিক সকালের মত অঙ্গভঙ্গি করে ক্র্যামার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাকে যেন কি বলছে। অবিরাম তাপের প্রবাহের ফলে সে সামনের দিকে এগোতে পারছিল না। আর এ এমনই এক ধরণের তাপ যে চোখ ছাড়া আর কোথাও ঢুকতে জানে না। কার সঙ্গে ক্র্যামার ঝগড়া বাধিয়েছে সেটা আমি প্রথমে বুঝতেই পারিনি। স্টেজের সামনের দিকে আসার পরে ঝগড়ার উৎসটিকে খুঁজে পেলাম।

একটা জীবন্ত প্রাণী। আমি তার সম্মুখে গেলাম, দেখলাম, তারপর ফিরে এলাম। প্রাণীজগতের কোন আকারের সাথে এর মিল নেই; কিন্তু একটা নিজস্ব পূর্ণ গঠন আছে। কোন অংশটাই এর একটা নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে নয়, সব আলাদা। জীবের সাধারণ লক্ষণ অর্থাৎ লজ্জা, উত্তেজনা এসব কোনটাই এ দেহের মধ্যে নেই। তার সৌন্দর্য্যের এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য। সমগ্র মাথা নিয়ে গাল পর্যন্ত চোখে ভর্তি। মাথার পিছন থেকে যে রয়ে এসেছে দুটো বলিষ্ঠ ডানা। সেগুলো মাঝে মাঝে ভাঁজ হয়ে চোখগুলি ঢেকে দিচ্ছে। ভাঁজ করার সাথে সাথে এক ঝলক গরম বাতাস ছড়িয়ে পড়ছে। কোনরূপ গলা নেই বললেই হয়। কাঁধের নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে এক

জোড়া কোমল কঠিন ডানা। তৃতীয় জোড়া ডানা পায়ের গোছ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। দেখলে মনে হয় ওগুলো দেহের ভার বহন করছে। এরকম একটা দেহ বহন করার পক্ষে পাগুলো খুব দুর্বল বলে মনে হচ্ছিল।

আফ্রিকায় বসবাসকারী ইউরোপীয়গণ আগন্তুকদের উত্তেজিত করার জন্য 'কিচেন কাফ্রে' বলবেই।

—'হাম্বা' অর্থাৎ 'দূর হটো' ক্র্যামার উচ্চস্বরে বলল।

—'মঞ্চ ছেড়ে তুমি বরং গোলমাল থামাও'। মৃদুকণ্ঠে শান্তভাবে সেই জীবন্ত বস্তুটি উত্তর দিল।

—'এই মর্তে কে তুমি বাছা'? তাপের মধ্যে হাঁফাতে হাঁফাতে ক্র্যামার জিজ্ঞাসা করল।

—'স্বর্গে যিনি থাকেন, সেই তিনি···অর্থাৎ একজন উচ্চশ্রেণীর দেবদূত। উত্তর এল। 'অন্য কোথাও গিয়ে এসব কথা বল। আমাকে কি মূর্খের মত দেখতে?'

ক্র্যামার হাঁফাতে হাঁফাতে বলল।

সেই দেবদূতের দেহ থেকে নির্গত উত্তাপে স্থানটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ক্র্যামারের মেকআপ ধুয়ে চোখে ঢুকে গেল। পাতলা পরনের পোষাক দিয়ে সে মুখ মুছতে লাগল। তাপ যেখানে অপেক্ষাকৃত অল্প ক্র্যামার সেখানে পিছিয়ে এল, তারপর চিৎকার করে বলল :

—একবার নয়, চিরকালের মত'

—'সঠিক' দেবদূত বলল।

—'এটা আমার শো' ক্র্যামার বলল।

—'কখন থেকে?'

—'এই শুরু হল বলে।'

—'ভাল, গোড়া থেকে যখন আমারটাই শুরু হয়েছে তখন প্রথমটা প্রথমেই হোক।' দেবদূত বলল।

ক্র্যামার মঞ্চ থেকে নীচে নেমে এল। সে দেবদূতের পোষাকটা নখ দিয়ে ধরে চড় চড় করে ছিঁড়ে ফেলে বলল :

—'শোনো, শোনো। তোমার মত সত্যিকার দেবদূতের এই জাতীয় অস্বাভাবিকতা আমার ধাতে একদম সয় না।

—'সত্যি'! দেবদূত বলল।

এর পর সেই উত্তাপ আমাকে একদম সামনের প্রবেশপথের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে এল। ক্র্যামার সেখানে আমার সঙ্গে মিলিত হল অনেক স্থানীয় লোকজন সেখানে জড় হয়েছে। অনেক দর্শক তখন গাড়ী করে আসতেও শুরু করে দিয়েছে। পিছন দিক থেকে অবশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রী নর্তক-নর্তকী বাড়ীর চতুর্দিকে এসে জায়গা নিয়েছে, ঐ দেবদূতের শরীর থেকে নির্গত তাপের ফলে বাড়ীটার ভেতর দিকের কোন কিছু দেখা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। পুনর্বার যে প্রবেশ করব তারও উপায় নেই।

ওদিকে ক্র্যামার তখন জনগণের সম্মুখে দেবদূত সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করছে। দেশীয় লোক, হোয়াইট হল, চিতাবাঘ এই তিনটির কোনটিকে কেন্দ্র করে বর্তমানে গোলমাল বেধেছে এদিকে নবাগত অতিথিদের মধ্যে সেই নিয়ে নানারকম জল্পনা কল্পনা চলছে।

ক্র্যামার গলা ফাটিয়ে বলল : 'এ আমার মূলধন, জনতা আসনের জন্য অর্থ দিয়েছে। ওরা এসেছে 'ম্যাস্ক' দেখার জন্য।'

—'তাহলে আমি ঠাণ্ডা হচ্ছি, তারা আসুক, ম্যাস্ক দেখুক'। দেবদূতের জবাব।

—'আমার ম্যাস্ক।'—ক্র্যামার বলল।

—'আঃ। না, আমার ম্যাস্ক, তোমার ম্যাস্ক হবে না।'

—'তুমি যাবে, না আমি পুলিশ ডাকব?' ক্র্যামার চূড়ান্ত উত্তর চাইল।

'আমার কথার নড়চড় নেই।' এই তার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত।

চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে গ্যারেজে একটা পাগলা চিতাবাঘ ঢুকেছে। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাড়াতাড়ি যে যার গাড়ীতে উঠে পড়ে নিরাপদ স্থানে গিয়ে ঠাঁই নিল। তামাক চাষীটা গেল বন্দুক আনতে। ব্যাটা পাগলা চিতাবাঘকে পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে কানা করে দেওয়ার কথা কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈনিক ভাবল। পাম্প থেকে তেল নিয়ে পেট্রোলের টিনে তা ভরবার জন্য ওরা কয়েকজন লোককে একাট্টা করল, তারপর ভরা মাত্র হাতা-হাতি করে গ্যারেজে চালান করে দিল।

—'এতেই ব্যাটা অন্ধ হবে।' একজন অশ্বারোহী সৈনিক বলল।

—'হ্যাঁ, এইটাই ঠিক, টের পাক ব্যাটা নচ্ছার।' দরজার পাশে যেখানে ক্র্যামার দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে বলল।

—'আমার মতে এটা করা উচিত নয়, তোমরা একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটাবে,'

দেবদূত বলল।

প্রথম কিস্তি পেট্রোল তাপের মধ্যে ছেটানো হলে তা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। প্রথমেই বসবার আসনগুলোকে আগুন গ্রাস করল। তারপর ভিতরের সমগ্র অংশটা যতক্ষণ না আগুনের লেলিহান শিখা ভক্ষণ করল ততক্ষণ বাতাস নিজেই ধাতুর দেওয়ালগুলোকে পোড়াতে লাগল। ঠিক তখনই আর এক দল অশ্বারোহী সৈন্য সেখানে এসে পড়ল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোকজন নিয়ে পেট্রোলের টিনে জল ভরতে লেগে গেল। ধীরে ধীরে তারা আগুনকে বশে আনল। ফ্যানফারলো তার দেবদূতদের রাস্তার একটা ছোট্ট অংশে জড় করল। সে তাদের পিতামাতাদের নতুন আশ্বাসে সঞ্জীবিত করতে চেষ্টা করছিল এবং ঐ সময়কার ঘটনার কথা তাদের উপলব্ধি করতে অনুরোধ করছিল। নাচবার সুযোগটা হাতছাড়া হওয়াতে সে ক্রোধান্ধ হয়ে উঠেছিল।

এটা আগুন নেভাবার কয়েকঘণ্টা আগেকার কথা। ঢেউতোলা টিনের দেওয়ালগুলো তখনও ঘুমড়ে মুচড়ে একাকার হচ্ছে। শিখাহীন আলো আর উত্তাপ বেরিয়ে আসছে তা থেকে। এই সময় সেই অপ্রত্যাশিত দেবদূত অভিঘিটির দিকে লক্ষ্য রাখা সত্যিই অসম্ভব। সকলে মিলে আগুন নেভাবার পরে তাপ ও অন্ধকারের জন্য গ্যারেজের ভেতরদিকের কোন অংশটুকুই দেখা যাচ্ছিল না।

—'আপনার বীমা করা আছে?' ক্যামারের এক বন্ধু ক্যামারকে জিজ্ঞাসা করল।

—'হ্যাঁ, প্রায় সবরকম দুর্ঘটনার জন্যই আমি বীমা করেছি, শুধু বিদ্যুৎ, বন্যা অর্থাৎ যেগুলো ভগবানের কর্ম—সেগুলো বাদে।' ক্যামার জবাব দিল।

—'উনি সবরকম দুর্ঘটনার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।' ক্যামারের এক বন্ধু অপর এক বন্ধুকে বলল।

—অধিকাংশ লোকই তখন বাড়ী চলে গেছে। অবশিষ্ট যারা আছে তারাও যাই যাই করছে, অনেকে বাড়ীর দিকে চলেছেও। অশ্বারোহী সৈনিকগণ 'গুড কিড ওয়েনসেসলাস' গানটি গাইতে গাইতে গাড়ীতে করে চলে গেল। ছেলেরা রাস্তায় নেমে দৌড়তে দৌড়তে গাইল 'গুড ক্রিশ্চানমেন, রিজয়েস।'

প্রায় মাঝরাত্রি, সমান গরম। তামাকচাষীটা জানাল যে জলপ্রপাতের

দিকে একটু যাওয়া যাক, ওদিকটা বেশ শীতল। ক্রামার ও ফ্যানফারলো আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে এল। ক্রামারের ওখান থেকে প্রধান সড়ক পর্যন্ত ভাঙ্গা উঁচুনীচু রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ী ওঠানামা করতে করতে চলল। গাড়ীর চাকা কোনরকমে ধরবে এমন দু ফালি সঙ্কীর্ণ রাস্তা এখানকার। আমাদের গন্তব্যস্থলের দু মাইল আগে থেকেই আমরা জলপ্রপাতের গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম।

—'ওঃ! থামুন ত আপনি, ফ্যানফারলো বলল।

ঠিক তখন আমাদের গাড়ীর চোখ ঝলসানো আলোয় আমি সেই দেবদূতটিকে দেখতে পেলাম। ঘণ্টায় সে প্রায় সত্তর মাইল গতিতে যাচ্ছিল, সে তার মোট ছ'টা ডানার দুটো দিয়ে কাজ চালাচ্ছিল। দুটো ডানা মুখটিকে আর দুটি ডানা পা গুলোকে ঢেকে রেখেছিল।

—'ঐ যে, ঐ যে' ক্রামার বলল—'আমরা এখনও ওকে ধরতে পারি।'

হোটেলের কাছে আমরা গাড়ী ছেড়ে এলাম। তারপর যেন ফরেস্টের সবুজ গাছগাছালির ভেতর দিয়ে গভীর বনে চলে গেছে এক পায়ে হাঁটা পথ —সে পথ ধরে চলতে লাগলাম, এখানে জলপ্রপাতের জলকনাগুলো অবিরত বৃষ্টির মত নেমে আসছে। গরমের পরে বৃষ্টিপাত-এ যেন অরের পর নতুন করে শক্তিসাত করা। সেই পলাতক শ্রেষ্ঠ দেবদূতকে আমাদের সামনে অনেক দূরে গাছপালার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম, তার উত্তাপ সেখানকার জলকনাকে বাষ্পে পরিণত করে দিচ্ছে।

আমরা খাড়া এক পাহাড়ের কিনারায় এলাম। আমাদের উল্টোদিকে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার সমান উচ্চতা থেকে নদীর প্রধান স্রোত উচ্চনিনাদে দুপাশের গিরিখাতের মধ্যে পড়ছে। কিন্তু সে কোথায় গেল? তার যে চিহ্নই নেই। সে কি অনেক নীচেকার কোন গর্ভে ঢুকে পড়েছে? কোথায় তাহলে?

তারপর আমি লক্ষ্য করলাম মাইলের পর মাইল জলপ্রপাতের বুক জুড়ে জলকনা আগের চেয়ে অনেক বেশী উড়ছে। আমার মনে হচ্ছে দেবদূতের শরীরের উত্তাপ থেকে তার উৎপত্তি। আমার ধারণা ঠিক। গ্রীষ্মের বিদ্যুৎ ঝলকে আমরা তাকে আমাদের থেকে দূরে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জাম্বেসীর উপর দিয়ে ভেসে ভেসে চলে যেতে দেখলাম। পাহাড়গুলোকে তখন কুমীরের মত দেখাচ্ছিল আর কুমীরগুলোকে পাহাড়ের মত।

গৌর ক্ষ্যাপা

রত্নেশ্বর বর্মন

গৌর ক্ষ্যাপার সঙ্গে আমার পরিচয় কেঁদুলির মেলায়। বস্তুত সে মেলায় দু-একবার যারা গেছেন তারাই চিনবেন তাকে। সে নিজেই নজর কাড়ে সকলের। চাঞ্চল্যে প্রাণ প্রাচুর্যে। তাই আমার মতো গোমড়ামুখো লোকেদের পক্ষপাত বর্ষিত হয় ওর ওপরে।

সব সময়েই যেন প্রাণচাঞ্চল্যের প্লাবন বয়ে চলেছে দেহের ওপর দিয়ে। কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে, কখনও বা আনন্দে করতালি দিয়ে নাচছে। এমনি আমাদের গৌর ক্ষ্যাপা—গৌরদাস বাউল।

মোটামুটি মাঝারি চেহারার যুবক গৌরদাস। বয়স কতো হবে? বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। হয়তো বা তার চেয়ে দু এক বছর বেশি। তার বেশি নিশ্চয়ই নয়। গায়ের রং ঠিক গৌর বর্ণ নয়, বরং একটু চাপা। তীক্ষ্ণ নাসিকায় দু দিকে চলচলে দুটো চোখ, যেন পৃথিবীর যাবতীয় স্বপ্ন, দুঃখ, আনন্দ, কৌতুক অনন্তকাল সেখানে জমাট বেঁধে আছে। গানের গলাটা তার তেমন আহামরি ভালো নয়, একটু ভাঙাগোছের, চাপা। ওর থেকে অনেক সুরেলা কণ্ঠ শোনা যায়, এই কেঁদুলির মেলাতেই। তবু আমাদের গৌরদাস-অদ্বিতীয়। ওর গলার খাটতি আবেগে পুষিয়ে দিয়েছে।

গানের আসরে ঢুকেই অঙ্গভঙ্গি করে হাসে গৌরদাস, অন্যের গানের মধ্যেই গিয়ে সুর মেলায়, গাবগুবাগুব বাজিয়ে ধ্বনি দেয়—'বাবারা গৌর ক্ষ্যাপা এসে গেছে, সবাই ধ্বনি তান—'হরি হরি বল, জয় গৌর বল।' পুরুষ নারী সকল শ্রোতা হাসাহাসি কানাকানি করে—'এই ক্ষ্যাপা এসে গেছে।'

কেঁদুলির মেলায় যাই কি বছর। কোন পরমার্থের সন্ধানে নয়, নিতান্ত গান শুনতে, গান ভালোবাসি বলে। গৌর দাসের সঙ্গে আমি আলাপ নিজে যেচে করিনি। বরং গৌর দাসই করেছে। তবে আমারও ইচ্ছে ছিল ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের। এর আগে চোখাচোখি হয়েছিল কয়েকবার গত বছরে। কোন সময়ে মাথা নেড়ে প্রশংসা করেছি ওর গান, ও হাসিমুখে

তা গ্রহণ করেছে। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে বাইরে চারদিকে ঘুরে ফিরে নেচেছে আর গেয়েছে—

কোন এক রসিক পাগল
বাধালে গোল,
বাধালে গোল নদেয় এসে,
কোন এক রসিক—পা-গো-ল।

সে বছর পৌষ সংক্রান্তির দিন সকাল থেকেই আকাশে কালকা মেঘের আনাগোনা। কুয়াশা কম, কেমন ঘোয়ামোছা প্রকৃতি। ভাবনা হচ্ছিল, বুঝি বৃষ্টি নামে। নামলও তাই। আমাদের বাস বোলপুরের এলাকা ছাড়াবার পরই প্রবল বর্ষণ।

বাস থেকে নেমে প্যান্ট-কোট সবকিছু ভিজে সপসপে হয়ে গেল। মেলার অঞ্চল জলে-কাদায় থকথক করছে। আমি মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই খুঁজছি। হঠাৎ তমালতলার কুঁড়ের ভিতর থেকে গৌর ক্ষ্যাপা সাড়া দিল—'জয় গৌর গো দাদা, জয় গৌর। আমার মায়ের আশ্রয় থাকতে ভেজেন কেনে?' গৌরদাস আমার হাত ধরে আবড়ার মধ্যে নিয়ে গেল—'আসুন দাদা।' ওর এমনি স্বচ্ছন্দ ব্যবহার যেন আমি তার কতদিনের পরিচিত। আপনজন।

আগুনের ধুনির পাশে এক বয়স্কা বৈষ্ণবী বসে ছিল। পরণে সরু পাড়ের মোটা ধুতি। গায়ের রঙ এখনো পাকা ধানের মতো। টিকলো নাকে রস-কলি আঁকা। গৌর ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—'আমার মা, শচীরানী গো দাদা। এর আগেও এই বৈষ্ণবীকে দেখেছি এই মেলায়। আলাপ ছিল না, এবার হলো। বৈষ্ণবী অভ্যর্থনা করল 'জয় গৌর, জয় গৌর, বসো বাবারা।' গামছা এনে দিল, বলল—'আহা বাছারা নেয়ে গাতে:, মাথা মুছে ফেল।'

বৈষ্ণবী আমগাছের শুকনো গুড়ি ধুনির আগুনে ঠেলে দিল। সেই আগুনে চা তৈরী করল, দুধ ছাড়া চা। আমাদের সামনে এগিয়ে দিল···'এই টুকুন চা সেবা হক বাবারা'। পাটকাঠির আগুনে নতুন মাটির হাড়িতে খিচুড়ি রান্না হল। সেই খিচুড়ি খাওয়া হল শালপাতায় করে।

বাইরে দুর্যোগ, জল ঝরছে অবিরল। তার মধ্যেও ঝুপড়িতে গান চলল সারারাত। গৌরদাস একাই একশ। গাঁজার কলকে দুহাতে জাপটে ধরে সজোরে টান দেয় ঘন ঘন, ধোঁয়া ছেড়ে নতুন করে গান ধরে—

নিমাই দাঁড়ায়ে, দাঁড়ায়ে নিমাই
দেখিব তোমারে
নিমাই দাঁড়ায়ে।

গৌরদাস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। হরিদাসী বৈষ্ণবী খঞ্জনি বাজাচ্ছিল। বাজনা বন্ধ করে কাপড়ের আঁচলে চোখের জল মুছতে লাগল। মেয়েদের অন্য অনেকেরও চোখে জল। আমরা লেখাপড়া জানা মানুষ, অত সহজে চোখে জল আসে না। আমি ক্ষ্যাপাকে শুধাই—'কী দুঃখে কাঁদ আর কী দুঃখে হাস।'

গৌরদাস বলে—'সে-কী আমিও জানি দাদা। হাসি এলে হাসি আর কান্না পেলে কাঁদি। কুনটা দুঃখ কুনটা সুখ সেও কী ছাই বুঝি।' গৌর নিজে গান তৈরী করে খালি গলায় সুর জুড়ে দেয়—

কুনটা সুখ কুনটা দুঃখ তাও কী জানি,
ও দীন গৌর বলে হাসি কান্না সমান ভেবে
ও ভোলা মন,
লওরে শরণ গুরুর চরণ।

ক্ষ্যাপা আমাকে ডাকে—'সন্ন্যিসি দাদা।' আমি বলি—'কী ক্ষ্যাপা, এ তোমার কেমন ধারা ডাকগো। আমি যে ঘোর সংসারী।'

গৌর বলে—'ওখানেই দাদা তোমায় ছলনা, সংসারের সং-এর আড়ালে কেমন মজায় নিজেকে লুকিয়ে রেখেছ।'

ক্ষ্যাপার এ ক্ষ্যাপামী আমি বুঝি না।

গৌর বলে—'দাদা আমার হাতে পড়ে গেছ ধরা। যেমন ধরা পড়ে ঠাকুর ননীচোরা।'

ও দুষ্টুমি ভরা হাসি হাসে।

এর পরেও দু-একবছর কাটল। প্রতি পৌষ সংক্রান্তিতেই মেলায় গিয়েছি। আস্তানা নিয়েছি হরিদাসী বৈষ্ণবীর আখড়ায়। গৌরদাসের একই রূপ। দেখা হলেই দু হাত জড়িয়ে ধরেছি—'জয় গৌর ক্ষ্যাপা।' গৌরদাস ওর স্বাভাবিক হাসি হাসে—'আমার জয়ধ্বনি কর কেনে গো দাদা?' গৌর শুধায়—'তোমাদের ওদিকটায় সব ভালো ত?'

আমি মাথা নাড়ি।

গৌরদাস বলে—'চল দাদা, এবার শ্মশানে গান জমেছে। সেখানে যাই।' ক্ষ্যাপা আমাকে টেনে নিয়ে যায়। ভীড় ঠেলে আমাকে নিয়ে আসরের কেন্দ্রস্থলে ঢুকে পড়ে। গৌরদাস আসরে এলেই শ্রোতাদের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। ক্ষ্যাপা কোমর দোলায়, হাসে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে। বলে—'দাদারা সব গলা লাগান। হরি হরি বল, জয় গৌর বল। জয় গিরিধারী বল। জয় রাধারানী বল।'

গৌরদাস উবু হয়ে বসে গাঁজার কলকেতে টান দেয়। শীতের রাত্রির কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া অজয়ের বুক থেকে বয়ে আসে। অদূরে নদীর বালিচড়ায় শব সৎকার হচ্ছে। দাউ দাউ আগুন নজরে আসে। আমি শীতে জড়সড়ো হয়ে বসে থাকি। মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। ক্ষ্যাপার গান শুনি—

চুল যে পাকিল দন্ত ঝরিল
কালে কালে খসিয়া পড়িল,
রঙ্গিলা দালানের মাটি গো সাঁইজী
কোন রঙ্গে বাঁধিয়াছ ঘর মনরে।

পরের বছর মেলায় যাই যথারীতি। হরিদাসী বৈষ্ণবীর সাদর অভ্যর্থনা পাই—'যাক ছেলে দেখছি ভোলেনি আমায়। জয় গৌর, জয় গৌর। সঙ্গের জিনিষপত্তর ঘরে ঢুকিয়ে রাখ বাবা।'

আমি শুধাই—'কী গো মাতাজী, তোমার গোরাচাঁদ কোথায়?'

বৈষ্ণবী আক্ষেপ করে—'আর বলো না বাবা, সে এক ডাকিনীর পাল্লায় পড়েছে।' হরিদাসী বৈষ্ণবী চোখের জল মোছে। আমি অপ্রতিভ হয়ে যাই। আমি জানতাম, হরিদাসী গৌর দাসের গর্ভধারিণী নয়। তবুও গৌর ছিল মা বলতে অজ্ঞান।

এতদিনে গৌরদাসের মন মজেছে। জানা গেল, এক বুমুরের দলের মেয়েকে নিয়ে সংসার পেতেছে গৌর ক্ষ্যাপা। আমি মনে মনে বলি—হাঁ, এ ওর দ্বারাই সম্ভব।

এবারের মেলা আমার কাছে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। বার বার মনে পড়ছিল—সেই গলা—সেই সদা হাস্যময় ক্ষ্যাপাকে আর তার গান—'কোন এক রসিক পাগল।' সারারাত ঘুরে ঘুরে গান শুনলাম। মন বসল না। সকালে বৈষ্ণবীকে বললাম—'মাতাজী আসি।'

বৈষ্ণবী বিস্মিত হল—'সে কী গো বাবা, আর থাকবে নাই!'

শুনেছিলাম, ইলামবাজার থেকে বোলপুরে যাবার যে রাস্তা, তার ডানদিকে গৌর ক্ষ্যাপা তার নতুন সংসার পেতেছে। খুঁজে পেতে খুব দেরি হল না। একজন চাষী বলল—'গৌর ক্ষ্যাপার আখড়া?' তারপর অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাল। দেখলাম, মাঠের প্রায় মাঝখানে একজোড়া তালগাছ, একটা পুকুর, একটা গাছ, বট অথবা অশ্বত্থ। তার পাশে দু-চার খানা খড়ো ঘরের জটলা।

গৌর ক্ষ্যাপা আমায় দেখে হৈ হৈ করে এগিয়ে এলো। 'জয় গৌর, জয় গৌর দাদা। আমি জানতুম তুমি আসবে। এই ছাখো রাধা কে এসেছে।' গৌর আমাকে একরকম ঠেলেই দাওয়ায় তুলে নিল। চাটাই পেতে দিল।

দেখলাম, গৌরদাস ঠিক আগেকার মতোই আছে। তেমনি বড় বড় চুল। এখন আর মাথায় পাগড়ি নেই, চুলগুলোকে জড়িয়ে মাথার ওপর তুলে রেখেছে।

বৌটাকে দেখলাম। সাদা খোলের লাল পেড়ে আটপৌরে শাড়ী পরা। কৈশোর ছেড়ে সবে যৌবনে পা দিয়েছে। গায়ের রং গৌরদাসের মতোই চাপা। দুটি ডাগর চোখের তারায় দুষ্টুমি সদাই চটফট করছে। বৌয়ের হাত ধরে ঘর থেকে টেনে নিয়ে এল ক্ষ্যাপা। বলল—'আমার সন্ন্যিসি দাদাকে আবার লজ্জা।' আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—'কি গো দাদা, আমার রাধিকে কেমন হয়েছে?'

ক্ষ্যাপার কাণ্ডকারখানা দেখে আমি নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলাম। বললাম—'ক্ষ্যাপা তোমার পছন্দ বড় খাসা। নামখানাও বেশ, রাধা।'

—'ওর নাম ছিল পদ্ম, আমি নতুন নাম দিয়েছি, রাধা।'

বউটা দেখলাম বেশ চালাক চতুর। ও গৌরের মুখে হাত চাপা দিল চোখ পাকিয়ে ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে।

ক্ষ্যাপা বলল—'এই রাধা, সেই গানটা একবার শুনিয়ে দেনা দাদাকে। যে গান শুনে আমার মন মজেছিল।'

রাধা আবার তিরস্কারের ভঙ্গিতে চোখ পাকাল—'অ্যাই কী হচ্ছে?'

গৌর ক্ষ্যাপার নতুন সংসার দেখে আমার খুব ভালো লাগল। বিকেলের মধ্যে কলকাতায় ফিরব এমন ইচ্ছে ছিল, হলনা। ক্ষ্যাপা বলল—'আমি জানিনা; রাধা যদি ছাড়ে চলে যাও।'

রাধা খিলখিলিয়ে হাসল—'ইস, আমি তোমার দাদাকে আটকে রেখেছি আর কী। যাক না চলে কে সাধছে।'

দেখলাম, রাধা আমার ঝুলিটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। ওদের সচ্ছন্দ কৌতুকের ধারায় আমার সমস্ত গাম্ভীর্য ধুয়ে মুছে গেল।

বিকালে ছাড়া পেলাম। রাধা বলল—'সন্ধিসি দাদা, আবার আসছেন কবে?' আমি মাথা নেড়ে বললাম 'শিব জানি'।

ক্ষ্যাপা আমায় বাসে তুলে দিতে এল। আমি বললাম—'নতুন জীবন কেমন লাগছে ক্ষ্যাপা? গৌর পরিতৃপ্ত হাসি হাসল, বলল—'কী জানি।'

বললাম 'আর মেলায় যাবে না?'

—'নিশ্চয়ই যাবো দাদা, আগামী মেলায় রাধাকে নিয়ে যাবো।'

পরেরবার মেলায় পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার লেট ছিল অনেক। প্রায় দেড় ঘণ্টা। মেলায় যখন পৌঁছলাম, সন্ধ্যে সাতটা। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। সেই দারুন ঠাণ্ডার মধ্যেও লোকজন গিজ-গিজ করছে। অসম্ভব ভিড়। লাউডস্পিকারে গান শোনা যাচ্ছে চারদিক থেকে। সেই সম্মিলিত সঙ্গীত-ঐকতানের মধ্য থেকেও সহজে চিনতে পারলাম গৌর ক্ষ্যাপার গলা।

গানটা কোন আখড়ায় হচ্ছে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তবু জনতার জটলা ঠেলে ঠেলে গানের জায়গাগুলি খুঁজতে লাগলাম। এখন আর ক্ষ্যাপার গান শোনা যাচ্ছিল না। আমি তবু বেপরোয়া হয়ে খুঁজতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত ওকে খুঁজে পেলাম। হাঁ, আমাদের ক্ষ্যাপাই বটে। নদীর পাড়েই বটগাছ। সেই বটগাছের তলায় চট দিয়ে ঘিরে একটা আসর তৈরী হয়েছে। সেই আসরের মাঝখানে গাছের গুড়ির ওপর ক্ষ্যাপা অন্য কয়েকজন বাউলের সাথে বসে গাঁজা টানছে। পাশে শন্‌শন্ আওয়াজ করে হ্যাজাক জ্বলছে। এখানে বিরাট জনতার জটলা নেই। ভীষণ নিরিবিলি। কয়েকজন মাত্র কৌতূহলী শ্রোতা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ কেউ বলছিল—'কি গো বাবাজীরা, এবার সুরু হক না।'

আমার দিকে নজর পড়তেই ক্ষ্যাপা উঠে এলো। ওর গায়ে কাঁথা দিয়ে সেলাই করা একটা লম্বা কোট, মাথায় পাগড়ি। ও প্রসন্ন হাসি ছড়িয়ে বলল—'জয় গৌর, জয় গৌর, দাদা কখন এলে?'

বললাম—'এইতো এখুনি। কানে কানে শুধালাম 'কি গো ক্ষ্যাপা নবীন বৈষ্ণবীকে আনোনি ?

ক্ষ্যাপা তেমনি হাসল, বলল—'রাধা আমায় ছেড়ে আবার ঝুমুরের দলে চলে গেছে।'

আমি খুব বিমর্ষ হয়ে গেলাম। ক্ষ্যাপা বলল—'কী ভাবছ দাদা ?' আমার হাত ধরে টানল—'এসো দাদা ভিতরে এসো।' এক রকম টেনেই আমাকে গাছের গোড়ায় ওদের সকলের সঙ্গে নিয়ে বসাল।

শ্রোতাদের মধ্যে কে একজন বলল—'এবার গৌর বাবাজীর গান হোক।'

গৌর উঠে দাঁড়াল। এবং স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলল 'ধ্বনি তান বাবার। জয় গৌর বল, হরি হরি বল।' তারপর পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গাবগুবাগুব বাজিয়ে মাইকের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। নাচ—বাজনা অনেক ক্ষণ চলল। যন্ত্রের তারের মধ্যে দ্রুত আঙুল চালিয়ে এক সময় সে থামল। তারপর গলা ছেড়ে গান ধরল।

আগে জানিনা, জানিনারে দয়াল
আমায় পিরিতে পরাণ যাবে।

মনের আনন্দে গান গাইছে ক্ষ্যাপা। নাচছে, মাইকের চারদিকে পাক খাচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাচ্ছে, হাসছে। আমি অবাক বিস্ময়ে ক্ষ্যাপাকে দেখছিলাম। দুঃখ, বেদনা, বিরহ কোন কিছুই এই সদানন্দ মানুষটাকে যেন স্পর্শ করতে পারছে না। তার দেহের মধ্যে দিয়ে যেন অনন্ত আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে ওকে দেখছিলাম, বিস্মিত হচ্ছিলাম এ যেন আমাদের গৌর ক্ষ্যাপা নয়, অন্য এক অলৌকিক মানুষ। অন্য একজন, যাকে আমি চিনেও পুরোপুরি চিনতে পারি না।

আমি কখন আমার অজান্তে সেই আসরের ভিড় থেকে বেরিয়ে এসেছি। সামনে অজয়ের জল, বেলাভূমি, বামে শ্মশান, নদী পেরিয়ে শালের ডালে মাখামাখি জোছনা। গৌরদাসের গানের রেশ—'জানিনারে দয়াল'—বাতাসে বাজছে। আমার মনে হল আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীটাও কখনো কখনো কেমন অপরিচিত অলৌকিক হয়ে ওঠে।

কবি কাহিনী

দীনেশচন্দ্র সিংহ

ঢাকার নরসিংদী বাজারে বারোয়ারী কালী পূজা উপলক্ষে ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে দুই পালা কবিগানের জন্য কুঞ্জবাবুর দল বায়না পেল। বিপক্ষে কবিসম্রাট হরিচরণ আচার্য।

নকুলেশ্বর এযাবত হরি আচার্যের নামই শুনেছেন, কিন্তু দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়নি। আজ সেই সৌভাগ্য ফলবতী হতে চলেছে জেনে নকুলেশ্বরের মনে আনন্দ আর ধরেনা। কখন তাঁর দেখা পাবে কখন তাঁর গান পাঁচালী শুনে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবে এই এখন তাঁর ধ্যান জ্ঞান।

নির্দিষ্ট দিনে পানসী খুলে নরসিংদী অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথে পথে নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুর কাছে বসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন—আচার্য কর্তা দেখতে কেমন; কেমন গান করেন; কেমন পাঁচালী বলেন, ইত্যাদি।

কুঞ্জবাবু বললেন—কথায় বলে চক্ষু কর্ণ ছয় মাসের পথ। দু' একদিন পর যাঁকে দেখতে পাবে, যাঁর গান শুনতে পাবে তাঁর বিষয় প্রশ্ন করে লাভ কি? কি উত্তর দেব? তবে এক বাক্যে বলতে পারি তিনি অদ্বিতীয়। অর্থাৎ তাঁর মত জবাবে, গানে, সুরে, তালে ছন্দে ও বাক্যবিন্যাসে সর্বগুণ সম্পন্ন কবিয়াল পূর্বে ছিলনা, বর্তমানে আর হয় নি, ভবিষ্যতে হবে কিনা কে জানে?

কথাগুলি শুনতে শুনতে নকুলেশ্বর যেন কোন ভাব রাজ্যে প্রবেশ করে মনে মনে ভাবতে লাগলেন—আমি যদি তেমন কবি হতে পারতাম। ভগবান কি আমার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবেন?

গানের দিন ভোরবেলা নৌকা গিয়ে নরসিংদী বাজার ঘাটে পৌঁছল। নকুলেশ্বর কুঞ্জবাবুকে বললেন—দাদা আচার্য কর্তার বাড়ী নাকি এই নরসিংদী গ্রামে?

কুঞ্জবাবু—গ্রাম বলছিস কেন? এই বাজারের সঙ্গেই তাঁর শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার আশ্রম। সেই আশ্রমের ঘাটেই তাঁর পালী বাঁধা। তিনি

পাল্কীতেই থাকেন।

নকুলেশ্বর—তবে আমি গিয়ে একটু দেখে আসব ?

কুঞ্জবাবু—যাও, কিন্তু সাবধান কোন রকম ছেলেমি করে কোন কিছু প্রশ্ন করে তাঁকে যেন বিরক্ত করোনা।

নকুলেশ্বর যামিনী নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমের ঘাটে গিয়ে আচার্য কর্তার পাল্কীতে উঠলেন। মধ্য কামরায় যেখানে সব দোলারপত্র থাকে সেখানে গিয়ে বসলেন।

নকুলেশ্বরের সন্ধানী চোখ যাঁর সন্ধান করছে তিনি তাঁর জন্য রক্ষিত বিশেষ কামরার গদীর উপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে পদ্মাসনে মালা নিয়ে বসে আছেন—যেন বিশ্বামিত্র মুনি।

উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, আজানুলম্বিত বাহু, মুখে লম্বা দাড়ি, মস্তকে টাক, পেছনে সামান্য কিছু কেশ ঝুটি বাঁধা। চোখ দু'টি যেন কোন ভাবাবেশে ঢুলুঢুলু। নকুলেশ্বরের যেন আর তর সইছেনা, তিনি কারো অনুমতির অপেক্ষা না করে কর্তার কাছে গিয়ে চিপ্ করে প্রণাম করলেন।

আচার্য কর্তা তাঁর ডাক-সরকার কাশী নটকে বললেন—কাশী, এই ছেলেটি কেরে ?

কাশী নট—কুঞ্জ দত্ত মহাশয়ের ছাত্র। আপনাকে দর্শনের জন্য এসেছে।

আচার্য কর্তা নকুলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি নাম তোমার ?

নকুল—নকুলেশ্বর

আচার্য—কুঞ্জবাবুর সঙ্গে কত দিন আছ ?

নকুল—এই দুই বছর।

আচার্য—শিখেছ কিছু ?

নকুল—চেষ্টা করছি মাত্র।

আচার্য—টপ্পা পাঁচালী বলতে পার ?

নকুল—সামান্য দু'চার কথা বলতে পারি।

আচার্য—বেশ বেশ। গুরুপদে নিষ্ঠা রেখো, মানুষ হতে পারবে।

এই বলে তিনি আবার মালা জপায় মনোনিবেশ করলেন। নকুলেশ্বর আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলেন না। ভক্তিতে আর একটা প্রণাম করে পাল্কী হতে উঠে চলে এলেন।

কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে নকুল, আচার্য কর্তার

সঙ্গে দেখা হল ?

নকুল—আজ্ঞে হ্যাঁ, হয়েছে।

কুঞ্জবাবু—কেমন দেখলে ?

নকুল—কি আর বলব বাবা, আমার মনে হয় যেন কোন শাপভ্রষ্ট যোগী ঋষি এসে মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করেছেন।

কুঞ্জবাবু—এখন তাঁর পাঁচালী শুনলেই বুঝতে পারবে সকলে তাঁকে কবি-সম্রাট বলে মান্য করে কেন ? যাও, এখন আহারাদির ব্যবস্থা করে বিশ্রাম কর। রাত দশটায় গান আরম্ভ হবে।

নকুলেশ্বর তার মাঝিমাল্লা চাকরবাকর নিয়ে রান্নার কাজে লেগে গেলেন। বেলা বারটার মধ্যে আহারাদি শেষ করে সকলে বিশ্রাম করলেন। পুনরায় বিকাল চারটা থেকে আয়োজন করে রাত নটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে সকলে গানের আসরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জবাবু নকুলেশ্বরকে বললেন—আসরে কনসার্ট পার্টি পাঠিয়ে দাও।

ঢোল কাঁসি বেহালা সানাই ও হারমোনিয়াম নিয়ে বাদকবৃন্দ আসরে গিয়ে কনসার্ট আরম্ভ করলো। কনসার্ট শেষ হতেই সরলা, মানদা ভেলভেটের সাচ্চা জরির কাজ করা ঘাগরা ব্লাউজ পরে নর্তকীর বেশে আসরে চললেন—সে সঙ্গে পুরুষ গায়কেরা "বীনাপাণি কবি পার্টি" নামাঙ্কিত কালো রং এর মোক্তারী পোষাকের মতো পোষাক পরে আসরে গেলেন। সবার পেছনে সরলার দেওয়া ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবী চাদর পরে নকুলেশ্বর গিয়ে বসলেন।

আসর বন্দনা ভবানী বিষয় গান গেয়ে প্রথম আসর শেষ করে কুঞ্জবাবুর দল বের হয়ে আসামাত্র আচার্য মহাশয়ের দল আসরে এলেন। তবে তাঁর দলের লোকজনের কোন পোষাকের জাঁকজমক নেই। সাদাসিধা ধুতিচাদর পরা। দলে মেয়ে আছে দু'জন, চল্লিশ পঞ্চাশ বয়স। তাদের পরনে ঢাকাইয়া টাঙ্গাইল শাড়ী।

নকুলেশ্বর তাদের গান শোনার জন্য আসরের কাছেই বসে আছেন। দোহার পত্র সকলে আসরে এসে একখানা গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার ফটো সামনে রেখে নতজানু হয়ে প্রণাম করে উঠেই গান আরম্ভ করলেন—

গৌর রূপের ঝমকে, জগত চমকে, দমকে দামিনী—
এমন পিরীতি রসের মুরতিখানি, নদীয়ায় আনিল কে।
কিবে খঞ্জন গঞ্জন, নয়নে অঞ্জন, ত্রিলোক রঞ্জন তিলকে॥
ভোলে চরাচর চাঁচর চুলে, বনফুলের হার দুলিছে গলে,
তরুন অরুন নয়ন যুগলে, জলধারা গলে ঝলকে।
ঘন শিহরি শিহরি, শ্রীহরি বলিতে শ্রীশরীর পুলকে॥
ভজ পুণ্য ভূমি ধন্য যে নদীয়া।
গোরা সুরধুনী তীরে নাচে হরি ধ্বনি দিয়া॥
দাদা বসন্তে কয় হরিচরণ, পাবি যদি ঐ চরণ,
প্রিয়াজীর যুগল চরণে শরণ লও গিয়া।
শুধু গৌর-বক্ষ বিলাসিনী রানী বিষ্ণুপ্রিয়া॥

কথায় বলে "সাচা গুড় আঁধার রাতেও মিঠা"—গান তো নয়, যেন রেকর্ড চলছে। মেয়ে দু'টির কণ্ঠস্বর তেমন ভাল নয় বলে চারজন পুরুষ দোহারের উপরেই দল নির্ভর। তাদের নাম—সুবল, বিহারী, গোবিন্দ শাহা ও রাধা চরণ। তাদের গান শুনে নকুলেশ্বর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তিনি এতদিন মনে করতেন যে ঝালকাঠীর দলই ভাল গান করে, এদের মতো গায়ক-গায়িকা আর হয়না। কিন্তু আচার্য কর্তার দলের গান শুনে তার সে ভুল ভেঙ্গে গেল। যেন আকাশ পাতাল প্রভেদ। এক একজনার কণ্ঠস্বর কোকিল কণ্ঠকেও হার মানায়। সুরের মূর্চ্ছনায় আসর নিস্তব্ধ। সে গান নিজ কানে যে না শুনেছে লেখনীতে প্রকাশ করে তাকে তা বোঝান যাবেনা।

দ্বিতীয় আসরে নকুলেশ্বর দল নিয়ে গিয়ে একখানা মাথুর গান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা সম্বন্ধে বৃন্দাদূতীর ব্যাঙ্গোক্তি মূলক গান গাওয়ালেন। গানখানা শেষ করে বাইরে এসে আচার্য কর্তার জবাব শোনবার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু সে আশা তাঁর পূর্ণ হল না। আচার্য কর্তা এ আসরে এলেন না। তাঁর ছাত্র কাশী নট্ট ঐ মাথুর গানের জবাব দিতে আরম্ভ করলেন।

গানের জবাব শেষ করে তিনি গায়ে পড়ে দু'খানা 'রংফুকার' করে গেলেন, যথা—

ওদের দলে আছে দুইটা ছুঁড়ী,
ছুড়ী নয়তো তীক্ষ্ণ ছুরি,

ওদের মধ্যে ক্ষুরধার।
থাকবেন একটু হুঁসিয়ার॥
দেখি, বাগরা পরে ছুকরি নাচে,
ছোকরা থেকে পাছে পাছে,
নর্তকীদের মন জোগায়॥

এভাবে র রংফুকার করে কাশী নট্ট বের হয়ে গেলেন, কিন্তু তার এই গায়পড়া স্থূল আক্রমনে নকুলেশ্বর একটু মর্মাহত হলেন। কেন না তাঁর ধারণা ছিল যে হরি আচার্যের মতো একজন মহামানবের সঙ্গ করে কাশী নট্ট না জানি কত মহৎ গুণের অধিকারী হয়েছেন! কিন্তু এই রংফুকার শুনে তুলসীদাসের একটি দোহার কথা নকুলেশ্বরের মনে পড়ে গেল। যেমন তুলসী বলেছেন—

নীচ নীচাই নহি ত্যজে
সজ্জন হুকে সঙ্গ।
তুলসী চন্দন বিটপ বাসি
বিন বিষ ভয়ে ন ভুজঙ্গ॥ অর্থাৎ "রে তুলসি! চন্দন বৃক্ষে বাস করিয়াও সর্প যেমন বিষহীন হয় না, সেইরূপ নীচ ব্যক্তি সাধুসঙ্গ করেও তার নীচতা পরিত্যাগ করতে পারে না।" কাশী নট্টও তেমনি মহামানুষের সঙ্গ করে মহৎ হতে পারেনি। তাই এই অনর্থক ব্যক্তিগত আক্রমণ। তবে এ ব্যাপারে কাশী নট্টকেও ষোল আনা দোষ দিয়ে লাভ নেই। কবিগানের উদ্যোক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যেই কেহ কেহ কবিয়ালদের আদি ও স্থূল রসাশ্রয়ী রংফুকার বা মালফুকার গাওয়ার জন্য উত্তেজিত করে থাকে, এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য।

যা হোক, রংফুকার যখন গেয়েছে, তখন বিপক্ষকে তার জবাব না দিলে চলবেনা। নকুলেশ্বর আসরে গিয়ে জবাব গাওয়ালেন—

১। বললে, আমার দলে দুইটা ছুঁড়ী,
ছুঁড়ী নয়তো তীক্ষ্ণ ছুরি—
তোমার ভাগ্যে ঘটবে না।
ষোলে দুধের তৃষ্ণা মিটবে না॥
তোমার দলে দুইটা বুড়ী,
বয়স হয়েছে দু'তিন কুড়ি,

এদব পাকা শ্রোতার পাকা দাঁড়ি—
ভোতা ক্ষুরে কাটবেনা ॥
বললে, ঘাগড়া পরে ছুকরি নাচে,
ছোকরা থেকে পাছে পাছে,
নর্তকীদের মন জোগায়—
ওসে মন জোগায় না গান জোগায় ।
কাশী বাঁচেনা হিংসার জ্বালায় ॥
থাকে দুইটা বুড়ীর সাথে,
ছুঁড়ী জোটেনা বরাতে,
তাইতে দুধভাত দেখে পরের পাতে—
নিজের গালে চাপড় খায় ॥

এই বলে নকুলেশ্বর কাশী নটের রংফুকারের জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসরের শ্রোতারা বললেন—আমরা এখন টপ্পা পাঁচালী শুনতে চাই। নকুলেশ্বর অমনি টপ্পার লহর গান ধরলেন, যথা:—

আমি কল্পনায় রুক্মিনী সতী, তুমি নারায়ণ ।
অদ্য তোমার পূজা করিতে,
বাসনা করিয়ে চিতে—,
বড় সাধ করে বিধিমতে. করলেম আয়োজন ॥
আমি জলপদ্ম আর স্থলপদ্ম—
নীলপদ্ম স্বহস্তে করে চয়ন ;
অদ্য তোমায় ফুল সাজে সাজালেম মদনমোহন ।
যখন আনিয়ে রাধাপদ্ম,
সাজাই তোমার পাদপদ্ম,
বিরুদ্ধ হলে কি কারণ ?
কেন পায়ের পদ্ম মাথায় তুলে—
আজ তুমি কান্না কর নারায়ণ ?

এই রাধাকৃষ্ণ লীলাত্মক টপ্পার লহরের মাধ্যমে বিপক্ষ দলের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করে পরে ছড়া পাঁচালী মারফত উক্ত বিষয়বস্তু আরো ব্যাখ্যা করে বিবিধ পরিপোষক প্রশ্নের অবতারণা করে নকুলেশ্বর পাঁচালী শেষ করলেন।

নকুলেশ্বরের টপ্পার জবাব দিতে আচার্য কর্তার বদলে কাশী নট্টই লহর গাওয়াতে আরম্ভ করলেন, যথা—

তুমি কল্পনায় রুক্মিনী, আমি কৃষ্ণগুণাধার।
আমি ব্রজলীলা করে শেষ,
করেছি ঐশ্বর্যে প্রবেশ,
আমার দ্বারকা ঐশ্বর্যের দেশ, ঐশ্বর্যের আচার॥
নিয়ে ঋষভের 'রা' বৈবতের 'ধা'—
বাঁশীতে করতেম রাধার গুণগান!
ব্রজেশ্বরী কিশোরী, সে আমার গুরু গরীয়ান॥
তুমি আনিয়ে রাধাপদ্ম,
সাজালে মোর পাদপদ্ম,
তাইদেখে কেঁদে উঠল প্রাণ।
আমার ইষ্টনামের শ্রেষ্ঠ পদ্ম—
তাই আমি মস্তকে দিয়েছি স্থান॥

কাশী নট্ট রাধারাণীকে প্রেমের গুরু কল্পনা করে নানা প্রকারে রাধারাণীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে পাঁচালী বলে গেলেন। নকুলেশ্বরের চেয়ে কাশী নটের বয়স অনেক বেশী। কণ্ঠস্বরে তেমন মধুরতা ছিল না। কিন্তু পাঁচালীর ছন্দ ও রচনার পারিপাট্যে নকুলেশ্বর মুগ্ধ হয়ে গেলেন। নাই বা হবে কেন? তিনি অনেক দিন যাবত আচার্য মহাশয়ের সাহচর্য লাভ করেছেন। তাঁর পাঁচালীর ছন্দ ভাষা বেশ অনুকরণ এবং রপ্ত করেছেন। নকুলেশ্বর তাঁর পাঁচালীর ছন্দ শুনে মনে মনে বলতে লাগলেন—আমি যদি কিছু দিন আচার্য কর্তার সঙ্গ লাভ করতে পারতাম!

দ্বিতীয় আসরে নকুলেশ্বর উঠে কাশীনটের দেওয়া জবাবের প্রতি-জবাব দিতে লাগলেন, যথা—

বললে, রাধা তোমার প্রেমের গুরু শুনে লজ্জা পাই।
যেদিন বিলাস বাঞ্ছা পুরাতে,
বাসনা করিলে চিতে,
সেদিন তোমার বামাঙ্গ হতে, জন্ম নিল রাই॥
যদি তুমি রাধার জন্মদাতা—
বিচারে পিতা বলে বলা যায়।

কন্যা হয় পিতার গুরু
একথা শুনেছ কোথায় ?
যখন গুরু শিষ্য দুইজনে,
বসতে যুগল আসনে,
গুরু কেন থাকে শিষ্যের বাঁয় ?
হলে নিধুবনে কৃষ্ণকালী—
গুরু কেন অঞ্জলী দেয় শিষ্যের পায় ?

এরকম বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করে নকুলেশ্বর গোপকন্যা রাধারানীকে হেয় প্রতিপন্ন করে গেলেন।

দ্বিতীয় আসরের টপ্পার জবাব দিবার জন্য আসরের শ্রোতৃমণ্ডলী আচার্য কর্তাকে আসরে আসার জন্য অনুরোধ করলেন। নকুলেশ্বরও এতক্ষণ এ কামনাই করছিলেন। শ্রোতাদের অনুরোধ শুনে তাঁর আর আনন্দ ধরেনা। ঘন কৃষ্ণ মেঘের বারি বিন্দু লাভের আশায় উৎকণ্ঠিত চাতকের মতো নকুলেশ্বর আচার্য কর্তার আগমন প্রত্যাশায় বসে রইলেন।

কাশী নট্ট গিয়ে আচার্য কর্তার কাছে শ্রোতাদের অনুরোধের কথা জানালেন। আচার্য কর্তার একটা অভ্যাস ছিল যে আসরে ঢোল বাজার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে মালা নিয়ে বসে থাকতেন। আসরে কি হয় না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর চোখে ঘুম আসতো না। শেষ আসরে তাঁকে স্বয়ং যেতে হবে তা তিনি জানতেন বলেই আগেই প্রস্তুত হয়ে বসেছিলেন। কাশী নট্টের মুখে সংবাদ শোনামাত্র তিনি আসরে চললেন।

কাশী নট্টের সঙ্গে আসরে প্রবেশ করা মাত্র শ্রোতাগণ সকলে হরিধ্বনি করে তাঁকে স্বাগত জানালেন। দোহারগণ জানে যে তিনি আসরে বসবেন না ; যাওয়া মাত্রই গান আরম্ভ করতে হবে। সুবল, বিহারী উঠে দাঁড়াল। আচার্য মহাশয় দ্বিতীয় টপ্পার জবাব বলতে আরম্ভ করলেন, যথা—

বললে, রাধা কি সে গুরু হল বল দেখি ভাই।
এই যে সৎ চিৎ আর আনন্দময়,
ভক্তেরা আমাকে যে কয়,
ও সেই তিনটি শক্তির সমন্বয়, ভাবরূপিনী রাই ॥

বললে, কোনখানেতে গুরুর আসন,
কোনখানে শিষ্য থাকে দাও বলে।
গুরু রয় সহস্রারে, শিষ্য রয় জীব চতুর্দলে।
নাকি, আমার অঙ্গে জন্মে নাই—
মহাভাবের জন্ম নাই ;
আবির্ভাব হল ভূতলে।
সে যে সর্বলক্ষ্মী স্বরূপিনী—
তাই আমি নাম লিখি চরণ তলে।
যখন সাধক সিদ্ধাবস্থা পায়,
জ্ঞান থাকে না ডাইনে বাঁয়,
গুরু আর শিষ্যে যায় মিলে।
তখন সেব্য সেবক পূজ্য পূজক—
তাহাদের চরণ মস্তক যায় ভুলে।

এভাবে টপ্পার লহরখানা শেষ করে আচার্য কর্তা যখন পাঁচালীর ডাকছড়া অর্থাৎ ত্রিপদী ছন্দে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন নকুলেশ্বর হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। জেরা লেখার কলম ধরার শক্তি তাঁর রইল না। এর আগে নকুলেশ্বর দাশরথী রায়ের পাঁচালীখানা পড়েছেন ; অংশ বিশেষ মুখস্থও করেছেন ; কিন্তু আচার্য কর্তার উপস্থিত পাঁচালী ও ছন্দে দাশরথীকেও যেন হার মানিয়েছে। দাশরথী লেখা কবি। তিনি ভেবে চিন্তে পদের যোজনা করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে গেছেন। কিন্তু কবিয়ালদের তো চিন্তা করে বলার অবসর নেই ; উপস্থিত মতে আসরে দাঁড়িয়ে সুর ছন্দ ও যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে বক্তব্য বলতে হবে। আচার্য মহাশয়ের ছন্দ রচনা, ভাববিন্যাস ও বাক্যের পারিপাট্য শুনে নকুলেশ্বর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তার মনে হতে লাগল যে কবি দাশরথী হতে এ কবির শ্রেষ্ঠত্ব শত গুণে বেশী।

রাধারানীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য রাধাতন্ত্রের যে সব প্রমাণ আচার্য কর্তা প্রয়োগ করতে লাগলেন, নকুলেশ্বর আজ পর্যন্ত কোন কবির মুখে তা শোনেন নি। জেরা লেখার জন্য কলম ধরার ক্ষমতা হারিয়ে যাদুমন্ত্রে বশীভূত পুতুলের মতো তিনি বসে রইলেন।

ডাকছড়া অর্থাৎ ত্রিপদী বক্তৃতা শেষ করে আচার্য কর্তা ধুয়া ধরে সুরে গাইতে লাগলেন—

আমার মন বাঁধা রাধা চরণে ॥
আমার ধ্যানেতে রাধিকা, জ্ঞানেতে রাধিকা,
রাধিকা জীবনে মরণে ॥ মন বাঁধা…
নিরজনে আমি বসে চুপি চুপি,
সম্মোহিনী সুরে মুরলী আলাপি,
সংলাপে বিলাপে রাধামন্ত্র জপি—
থাকি রাধা নাম স্মরণে ॥ মন বাঁধা…
ষড়জ ছেড়ে যবে গান্ধারেতে যাই,
ঋষভেতে 'রা' আর বৈবতে 'ধা' পাই,
এই দুটি অক্ষরে রাধামন্ত্র গাই—
বিশ্বের সন্তাপ হরণে ॥ মন বাঁধা…
লোকে বলে আমার সচ্চিদানন্দ,
সৎ সত্যানন্দ, চিৎ জ্ঞানানন্দ,
আনন্দ স্বরূপে হ্লাদিনীর আনন্দ—
শ্রীগোবিন্দের নাম পূরণে ॥ মন বাঁধা…

এই ভাবে অনর্গল পদ বলতে বলতে হঠাৎ সুরের পরিবর্তন করে কীর্তন সুর দিয়ে জয়দেব কবির গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের কিশোরীভজন, পরকিয়া প্রেমের সাধন রহস্য এমন সুরসালঙ্কারে বর্ণনা করতে লাগলেন যে আসরের চতুর্দিক উলুধ্বনি হরিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

কবির পাঁচালীর ভিতরে কীর্তনের সুরে এইভাবে রসাল ভাবাত্মক বক্তৃতা নকুলেশ্বর আজ আচার্য কর্তার মুখেই প্রথম শুনলেন এবং স্তম্ভিত বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। পাচালীর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু লিখে রাখার মতো শক্তি নকুলেশ্বরের হল না। শুধু নকুলেশ্বরই বা বলি কেন; সে উপস্থিত বক্তৃতার ছন্দাবলী শুনে শুনে লিখে রাখার শক্তি স্বয়ং ব্যাসদেবের পক্ষেও সম্ভব হতো কিনা জানি না। কলম বন্ধ রেখে নকুলেশ্বর শ্রবণানন্দেই বিভোর হয়েছিলেন। ঘণ্টা তিনেক ধরে পাচালী বলে আচার্য কর্তা গান শেষ করে চলে গেলেন।

আচার্য কর্তার মুখনিঃসৃত পাঁচালী শোনার পূর্ব পর্যন্ত নকুলেশ্বর মনে মনে ভাবতেন—তিনি কবির পাঁচালী কিছু কিছু শিখেছেন। কিন্তু আজ তাঁর সে ভুল ভেঙে গেল এবং কিছুই শিখিনি বলে আক্ষেপ হতে লাগল।

তিনি ভাবলেন—হায় হায় যদি আমি কিছুদিন এই মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করতে পারতাম তাহলে তাঁর অগাধ কাব্যসাগর থেকে দু'এক বিন্দু পান ও পরিবেশনের পন্থা আয়ত্ত করতে পারলে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হতো।

লোকে বলে বাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান কারো বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না। এখানেও তাই প্রমাণিত হলো।

গানের শেষে কবি আচার্য মহাশয় কুঞ্জবাবুকে তাঁর পাল্কীতে ডেকে পাঠালেন। কুঞ্জবাবু দেখা করতে গেলে আচার্য কর্তা বললেন—দেখ কুঞ্জ, আমি একটা অনুরোধ তোমাকে করবো, যদি তুমি রক্ষা কর।

কুঞ্জবাবু—সে কি কথা! আপনাকে সামরা সকল কবিয়ালাই কবিগুরু বলে মান্য করি। আর আপনার একটা অনুরোধ রক্ষা করতে পারব না? বলুন, কি করতে হবে?

আচার্য কর্তা—দেখ, আমি এখন বুড়া হয়ে গেছি। আসরের খাটুনি বেশ আনা খাটতে পারি না। দলে দু তিনটা করে ডাক-সরকার রাখি, কিন্তু আমাকে একটু বিশ্রাম দিতে একটারও পারে না। তাই আমি তোমার কাছে একটা অনুরোধ করব বলে তোমাকে ডেকেছি।

কুঞ্জবাবু—অনুরোধ বলছেন কেন, আদেশ বলুন। আমি আপনার কি সাহায্য করতে পারি।

আচার্য কর্তা—অন্য কোন সাহায্য চাইছিনা। তোমার শরীরে এখনো বেশ শক্তিসামর্থ আছে। কবির আসরেও বেশ যশঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছ। আমি এখন বৃদ্ধ; একরকম অচল বললেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব তোমার ঐ ছাত্রটি নকুলেশ্বরকে যদি আমার সঙ্গে দাও তবে আমার বিশেষ সাহায্য হয়। আমি ওর পাঁচালী শুনেছি। ও সুরসঞ্চারে ও বচনবিন্যাসে যে নৈপুণ্য অর্জন করেছে তাতে মনে হয় ভবিষ্যতে ও একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিচিত হবে। সে যা হোক ঐ ছেলেটাকে যদি তুমি দাও, তবে শেষ জীবনে একটু বিশ্রাম নিয়ে গান করতে পারি—এই আমার অনুরোধ।

কুঞ্জবাবু—সে তো অতি সুখের এবং ওর সৌভাগ্যের কথা। তবে কি জানেন ঐ ছেলেটার মা আমার হাতে ওকে সমর্পণ করে দিয়েছেন এবং আমি ওর সব দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়ে এসেছি। এখন ওকে আপনার সঙ্গে দেওয়া ওর মা'র অনুমতি সাপেক্ষ। বিশেষতঃ এ বছরের গানের ফিরা তো শেষ হয়েই গেল। অল্প দিনের মধ্যেই দল নিয়ে দেশে রওনা হবো। কাজেই

আমি আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি আগামী সন দুর্গাপূজার পূর্বেই যাতে আপনি ওকে দলে পেতে পারেন আমি ওর মায়ের কাছে বলে কয়ে তার ব্যবস্থা করে দেব।

আচার্য কর্তার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কুঞ্জবাবু নৌকায় এসে নকুলেশ্বরকে এই সংবাদ জানালেন। নকুলেশ্বরের আনন্দ আর ধরে না। বাংলা ও বাংগালীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম অঙ্গ কবিগানের নবজন্মদাতা কবি-গুণাকর হরিচরণ আচার্য মহাশয় তাঁর গান শুনে প্রীতিলাভ করেছেন জেনে তিনি মনে মনে ভগবানকে অজস্র প্রণাম ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেন এবং কুঞ্জবাবুকে প্রণাম করে বললেন—আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। মনে মনে বাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবানকে প্রণাম করে বললেন—জয় ভগবান। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

(ক্রমশঃ)

প্রতারক

মদন দাশ

[এক]

সবকজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সামনে দাঁড় করিয়ে সে ভীষণ শাসাচ্ছিল, এবং সে মনে মনে এটাই চাইছিল যে আমি সকলকে দোষী করব, ধমকাবো, গম্ভীর মেজাজে তাদের বুঝিয়ে দেবো যে তারা ভুল করছে। তারা শুধু শুধু আমাকে আক্রমণ করতে চাইছে, আমাকে হেয় করতে চাইছে।

ঘটনাটা কি ঘটেছে? (তার তীব্র দৃষ্টি একজনের দিকে)—আমি তোমার ঘড়িটা নিয়েছিলাম। হ্যাঁ নিয়েছিলাম, বলেছিলাম একটা ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি তোর ঘাড়টা একটু দে। আমার এই যে ঘড়িটা (সে তার হাতঘড়ির কাঁচের ওপর আঙুল ঠুকল)—শালা দেখতে পাচ্ছিস না এটা দাদুর আমলের ক্যাভালার, ডায়ালটা নীল হ'য়ে গেছে, যখন তখন ব্রেক ডাউন। এটা আছেই সত্যি কিন্তু প'রে কি ভদ্র সমাজে কোথাও যাওয়া যায়? (একটু সময় চুপচাপ থাকে সে)—সুখের সময় এলে সব শালা দুঃখের দিনের কথা ভুলে যায়। এখন ভালো চাকরিটা বাগিয়েছিস, এখন আর তোর পুরোনো দিনের কথা মনে নেই। তখন যে আমি আমার টিউশনির নাম-মাত্র টাকা থেকেও তোকে কখনও কখনও কিছু দিয়েছি। বলতে গেলে তো এখন অনেক কিছুই বলতে পারি। আর সেসব কথা বলতে গেলে তো পেছনে ঝাল লেগে যাবে। দিদি তোর চাকরি করতে করতে বেশতো একটা উঁচু দরের অফিসারকে ঝুলিয়ে ফেললো—ও! ঝুলিয়ে ফেললো বললে অশ্লীল শোনাচ্ছে? ঠিক আছে তো মিষ্টি করে বলছি, প্রেম এবং বিবাহ করিয়াছে—সুতরাং এখন দিদি সংসার থেকে চলে গেলে বুড়ো বাপ মা, ভাইবোন, সব তো নর্দমা দিয়ে ভেসে যাবে। তাই জামাইবাবু তোকে একটা চাকরি করে দিলো, আর ঝপাৎ করে তুই একেবারে পেল্লায় গুণবান হ'য়ে গেলি। মাইরি, খুব ঝাল লাগছে শুনতে, না?

ঘটনাটা কি ঘটেছে? আমি তোর ঘড়িটা হারিয়ে ফেলেছি। হারিয়ে ফেলেছি তো কি হয়েছে? আমি কি তোর চেয়ে কিছু খারাপ ছেলে আছি

নাকি ? দস্তুর মতো ডিস্টিংশন পেয়েছিলাম। বলতে গেলে শালা নিজেকে কেমন ঠাট্টা করছি মনে হয়। তবু—তবু একদিন আমারও অবস্থা ফিরবে একদিন আমি—(বলতে বলতে একটু নরম হয়ে গেল)—তখন ওর চেয়ে দামী ঘড়ি তোর মুখে ঘঁদি ছুঁড়ে না মেরেছি—

এই সামান্য ঘটনা—আমি তোকে বলেছি ঘড়িটা হারিয়ে গেছে, কিন্তু তবু আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। তুই আমাকে অপমান করার তালে আছিস। শুধু তাই নয় মধু আর রামের সঙ্গে যোগসাজস করছিস, আমাকে মারবি। বাঃ! মধুর এখন খুব গোস্তানি হয়েছে। অমন নেতা দাদা পেয়েছে। গোস্তানি হবেই তো। শালা চামচা! (সে মধুর দিকে ফিরলো। তীব্র চোখ। আপাদমস্তক দেখে নিলো।)

অহো! নেতা দাদার কল্যাণে ভালই আছিস! এই জামা আর প্যাণ্ট খানা যা পরেছিস এর দামই তো শ-আড়াই টাকা হবে রে। আর এই নরম বড়ো বড়ো চুল, খুব দামী শ্যাম্পুট্যাম্পু রোজ মাখছিস মনে হচ্ছে? কি খুশ্‌বু ছাড়ছে মাইরি! আরি শালা, জুতোখানা কি পরেছিস? কত দাম রে? সত্তর? আশি? কলেজে যখন পড়তাম তখন তোর তাঁতের একখানাই পাঞ্জাবী ছিলো। তোর হাওয়াই চটির স্ট্র্যাপটা ফক্ ফক্ করে একশোবার খুলে যেত, নিচু হ'য়ে ছাঁদার মধ্যে আবার গলিয়ে দিয়ে কাকে যেন 'শালা' বলতিস্। কাকে বলতিস্? বাবাকে?

এখনতো বেশ আছিস। হিরো হিরো চেহারা হ'য়ে গেছে। অমন শুকনো গাল লালচে হয়ে গেছে। বেশ বেশ! মালটাল রোজ টানছিস বোধহয়? ভালো ভালো। গুছিয়ে নে। অনিলের জামাইবাবু তো আর তোকে চাকরি দেবেনা। আর চাকরি করেই বা কি হবে? ক'টাকা পাবি? এখন যা কামাচ্ছিস—তা কি কি ব্যবস্থা থেকে টাকা আসছে একটু বল্‌না। একটা তো জানি—জোড়া গীর্জার সামনে চার্চরোডে ফুটপাথের বাজারটা। ওটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ওটা তো তোদের জমিদারী। যারা বিক্রিবাটা করে তারা তোদেরকে খাজনা দেয়, বদলে তোরা ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করিস্। খাজনা না দিলে লাথি—

ওটা থেকে কতো আসে রে? শতকরা কতভাগ দাদাকে দিতে হয়? ওহো হ্যাঁ, ঐ আনন্দ নস্কর রোডে কর্পোরেশনের জায়গায় তোর ভাইকে একটা ষ্টেশনারী দোকান করে দিয়েছিস। ওটাতো জমজমাট। মূলধন

কোথা থেকে এলো মাইরি? তা যাকগে বলতে হবেনা। তুই আমার অনেক দিনের বন্ধু। তোর ভালো অবস্থা হোক তাতে আমার আনন্দ। কিন্তু তুই অনিলের সঙ্গে যোগসাজস করেছিস আমাকে মারবার জন্য? কেন? ও! তোর একশো টাকা দিতে পারছিনা বলে? তা ধার যখন নিয়েছি দিয়ে দোবো নিশ্চয়ই। দোবনা বলেছি? তুইতো এতো টাকা কামাচ্ছিস, এই একশো টাকা তোর এক্ষুনি না হ'লে চলছে না? আমি চিরকাল এরকম থাকবোনা রে। (তার গলার স্বর নরম হয়ে গেল) সেদিন এই কটা টাকা তোকে নিশ্চয়ই দিয়ে দোবো।

কিন্তু তোর শালা লজ্জা করেনা? তুই আমাকে মারবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিস? তুই শালা ভুলে গেছিস কতদিন তোর বাড়ীতে রান্না হয়নি, তুই না খেয়ে কলেজ যাচ্ছিস জেনে আমি তোকে বাড়ীতে খাইয়েছি। শালা বেইমান।

আর এই শালা রাম। (সে ফিরে দাঁড়ালো রামের দিকে) মধু শালা চামচা, আর তুই হচ্ছিস চামচার চামচা, শালা তুই একটা ছুঁচো। এখন মধু তোর গুরু হয়েছে। তা তুইতো শুনি গোটা কয়েক সাইকেল রিক্স করে ফেলেছিস। রোজ সন্ধ্যাবেলা ক্যাশ টাকা দিয়ে যায় রিক্সওলারা। আর সব ইনকামের ওপর এটা তো বেশ একটা ফিটফাট্ ইনকাম। দাদার দৌলতে ভালই করেছিস। আমি শুধু অবাক হ'য়ে যাই যার শালা সিগারেটের পয়সা জুটতো না সে এত টাকা পেলো কি করে? তা এই ছুঁচো চেহারায় আজকাল আবার খুব মেয়ে লাগাচ্ছিস। যতই মেয়ে লাগা তোকে আরও বিদঘুটে ছুঁচোর মতই লাগবে। স্ট্রেচ্ লনের প্যান্টতো তোর একজন বানিয়ে ফেলেছিস, তার সঙ্গে আরেকটা বেল্ট হ'লে কি হতো? তুই কি রাজেশ খান্না হয়ে যেতিস্? সেজন্যই তো তোর প্যান্টের কাপড়টা আমি ফেরৎ দিইনি। তোর শালা বোঝা দরকার সুন্দর চেহারা না থাকলে শুধু জেল্লাদার কাপড় সাঁটলেই বিউটিফুল হ'য়ে যাবিনা।

শালা আবার জুলফি রেখেছে দেখোনা! আবার গলায় পাউডার। তবু যদিনা ষাঁড়ের পিঠের মতো ঘাড় হতো। এক থাপ্পড় লাগিয়ে থোবনা ভেঙে দিতে হয়।

আসলে কিন্তু সে একটা চেয়ারে গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসেছিল।

একেবারে নিষ্কম্প বলা যায়। পেছন থেকে দেখলে মনে হবে বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছে।

উত্তেজনা তার মনের মধ্যে দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল এবং মনে মনে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সামনে দাঁড় করিয়ে সে ক্রমশঃ ভীষণ হয়ে উঠছিল। সহসা চিবুকে একটা মশা হুল ফোটালো। তার উত্তেজিত শরীর দপ্ করে জ্বলে উঠল। সজোরে থাপ্পড় লাগালো এবং হাতের তালুতে দেখতে চাইলো মশার মৃতদেহ। নিষ্ফলঙ্ক হাত। পলাতক মশা এবং নিজের গালে নিজেরই থাপ্পড়ের অনুনি—এসময় পলাতক মশাটা তার মুখের কাছে দুবার ফোঁ ফোঁ করে চক্কর মেরে কোনদিকে চলে গেলো। তাকিয়ে দেখল সে। জ্বলে উঠতে গিয়েও একটা হতাশা তাকে ঘিরে ধরছিল। আস্তে চোখ বুজিয়ে নিলো, (আমার জীবন থেকে কি যেন সব হারিয়ে যাচ্ছে। কি যেন সব···। জীবনে কি যেন সব এসে জুটছে···কি যেন সব কাঁকরের মতো···)

সে চেয়ারের কাঁধে মাথা এলিয়ে দিলো, দুহাত ছড়িয়ে দিলো হাতলে। (আসলে মা রেগে গেলে যা বলে সেটাই ঠিক—আমি একটা 'নিমুরোদে'। আমার কোন মুরোদ নেই। মায়ের ওপর আমি বৃথাই রাগ করি। মা ঠিকই বলে—বলে দেখ্ তোর বন্ধুদের, সকলে কেমন গুছিয়ে নিচ্ছে। অথচ আগে ওরাই তোর অনুচর ছিলো।)

সে দ্রুত গভীর হতাশায় ডুবে যাচ্ছিল। নিজেকে খুব অসহায় লাগছিল তার। (ওরা আমাকে মারবে। নির্ঘাৎ মারবে। আমাকে চুপচাপ মার খেয়ে যেতে হবে, আমি একটুও প্রতিবাদ করতে পারবোনা, বাধা দিতে পারবোনা। সে শক্তি আমার নেই। দিনের পর দিন তাইতো আমি চোরের মতো লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। ঘরে বসে থাকছি। অথচ ঘরে বসে থাকতে আমার একটুও ভালো লাগেনা। আড্ডায় গিয়ে বসলে সময়টা কেমন কেটে যায়, কিন্তু আমি যেতে পারছিনা।)

বাইরে কোথায় দূরে বেলা নটার সঙ্কেত জানিয়ে সাইরেণ বাজছিল। সে এভাবে বসেছিল যেন খুব দুর্বল। দোতলার জানালা দিয়ে সে নীচের রাস্তায় আনমনা দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছিল। ফিটফাট মানুষজন অফিস যাচ্ছে। কলেজের ছেলে মেয়েরা চলেছে। (একদিন আমিও ওরকম কলেজ যেতাম। বাবা মা তখন আমাকে খুব ভালবাসত, খুব যত্ন করত। তখন তাদের বড়ো গর্ব ছিলো—তাদের এমন প্রতিভাবর ছেলে।) ঈষৎ বাঁকা হাসি তার

ঠোঁটের কোণে ভেসে উঠল।

সাইরেন ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছিল। যেন কোনো বাঁশিওয়ালা বাঁশিতে সুর দীর্ঘ করিয়ে রেখেছে। বাঁশিওয়ালা—সে খুব আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল।

…সেই বাঁশিওয়ালাকে কতকাল দেখিনি। জীবন থেকে কি যেন সব হারিয়ে যাচ্ছে কি যেন সব…এবং কি যেন সব এসে জুটছে কাঁকরের মতো …সেই বাঁশিওয়ালা আর আসে না। হয়তো তার বাঁশি আর কেউ কেনে না। সেই দুঃখে হয়তো সে বাঁশি বিক্রি ছেড়ে দিয়েছে। নাকি মরেই গেছে? …ছেলেবেলায় আমার খুব বাঁশি বাজানোর শখ ছিলো। কিন্তু বাঁশি বাজানোতো কই আমার শেখা হয় নি? কেন? মা আমাকে সেই যে একটা বাঁশি কিনে দিয়েছিল…সেই গ্রীষ্মের ছুটিতে যখন স্কুল ছিল না, যখন সারাদিন ঘরে—নীচের বৈঠকখানা ঘর, জানালা দরোজা সব বন্ধ। ছায়া ছায়া অন্ধকারে শুন্ শুন্ করে পাখা ঘুরতো। ঠাণ্ডা মেঝের আঁচল বিছিয়ে মা ঘুমোতো। আঃ কি ঠাণ্ডা থাকতো ঘরটা, কি ভাল লাগতো!

…সে রকম শীতল সুখের দিন আর আসে না। মনে হয় সারাক্ষণ কি এক জ্বালা শরীরকে উষ্ণ করে রাখে। সেই শীতলতা নেই। সেই ভালবাসা নেই। সেই সবকিছুতে জড়িয়ে থাকা আনন্দ—ঘুঁড়ি লাটাই লাট্টু…আচ্ছা পেছনের বাগানে আমড়া গাছটায় এখনও বউল আসে? এখনতো বোধহয় বসন্তকাল? না কি গ্রীষ্ম এসে গেছে? না বোধ হয়। পয়লা বৈশাখ এখনতো হয় নি। তাহলে এখন বসন্ত। এখন কি আমড়া গাছটায় বউল এসেছে? কই দেখা হয়নি তো? অথচ ছেলেবেলায় রোজ একবার করে চোখ বোলানো —কই বউল কবে আসবে—সেই উৎসুক আনন্দ…

…আচ্ছা পয়লা বৈশাখে এখনও গৌর স্যাকরা নিমন্ত্রণ করে? আমি বাবার হাত ধরে যেতাম—সেই গোলাপ জলের গন্ধ! ঠাণ্ডা সরবত আর বাংতা দেওয়া পান! গোলপাকানো ক্যালেণ্ডারে কি ছবি আছে? বাড়ী গিয়ে খুলে না দেখা পর্যন্ত কি আকুলতা। সে সব এখন আর নেই কেন?

…আচ্ছা বাঁড়ুজ্জেদের ঠাকুর দালানে এখনও কি প্রত্যেক বছর সেরকম ঠাকুর হয়? সেই টানাটানা চোখ আর নাকে নথ? ঝলমলে ডাকের সাজে সবটুকু ঢাকা, আর বিরাট মুকুট? অনেক অনেক দিন আমি মায়ের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে যাই নি। আসলে সেই বাঁশিওয়ালা বোধহয় সব কিছু ভুলিয়ে

নিয়ে গেছে। একদিন বাঁশিওয়ালা দুঃখু করে বলেছিল—বাঁশি আর কেউ কেনে না খোকাবাবু! সেই যে কথামালায় একটা গল্প ছিল—সেই ছবিটা—বাঁশিওয়ালা চলেছে পেছনে অনেক সম্মোহিত ছেলেমেয়ে চলেছে তো চলেছে ···বাঁশিওয়ালা কি রাগ করে সেরকম সব আনন্দ ডেকে নিয়ে চলে গেল?

...বাঁশিওয়ালা বলত তার বাড়ী কোথায় যেন—সেই কি যেন—হ্যাঁ। সিং দেওয়া একটা জেলায়—হ্যাঁ। সিংভূম—সে গ্রামে চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়। সবুজ সব গাছপালায় ঢাকা। সেখানে টিয়া পাখীর ঝাঁক হুস হুস করে ওড়ে। সেখানে একটা ছোট ঝরণা আছে, ঠাণ্ডা জল পড়ে ঝির-ঝিরিয়ে···

তার ছেলেবেলায় গ্রীষ্মের ছুটির সময় এক বাঁশিওয়ালা আসতো। দুপুরে ঠাণ্ডা ঘরের মেঝেয় মা ঘুমিয়ে, সে একটুখানি জানালা খুলে বসতো। জানালার ওপারে বোয়াকে বসে গামছায় মুখ মুছতো বাঁশিওয়ালা, বসে বসে গল্প করত।

পাহাড়ের মাঝে তাদের গ্রাম। সেখানে ঢালু জমিতে সবুজ ঘাস, ছেলেরা সেখানে গরু চরায়। 'আমিও ছেলেবেলায় গরু চরাতুম আর বাঁশি বাজাতুম,' বাঁশিওয়ালা বলত, আমার ছেলেও খুব সুন্দর বাঁশি বাজায়। আমার ছেলে এখন গরু চরায়। আমার চারটে গরু আছে। জমিও আছে, ধান হয়, ছোলা হয়। কাঁচা ছোলা গাছ থেকে তুলে তুমি যদি খাও খুব ভালো লাগবে!

বাঁশিওয়ালা অনেকবার মুখ মুছতো। বলত, 'খোকাবাবু একটু জল খাওয়াবে?'

সে চুপি চুপি জল এনে দিতো। জল খেয়ে বাঁশিওয়ালা আঃ' বলতো। তারপর বলতো, 'কবে যে বৃষ্টি হবে, গাঁয়ে ফিরে যাবো, চাষ করবো!'

—'তুমি বুঝি শুধু গরমের ছুটিতে এখানে আসো? বাঁশিওয়ালার কি হাসি! বলতো, 'হ্যাঁ। হ্যাঁ। এখন আমার ছুটি, গরমের ছুটি···!'

(বাঁশিওয়ালা কোথায় গেল? আমার সেই বাঁশিটাই বা কোথায় গেল?) সে ঈষৎ ছটফট করল চেয়ারে। উঠে দাঁড়ালো, দুহাত ছুঁড়ল তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে গেল ছাদে।

সিঁড়ির পাশে ছোট্ট একটা ঘর। সে ঘরে শেকল দেওয়া। শেকলে

রোদে জলে জং ধরে আছে। দু হাতে টানাটানি করে সে শেকল খুলল, তারপর এক ধাক্কায় দরোজা দু ফাঁক। আস্তে ঘরে ঢুকল সে—এভাবে—যেন চুরি করতে ঢুকছে। ডানদিকে এগিয়ে যেতে গেলে হোঁচট খেলো. নীচু হ'য়ে দেখল একটা টিনের সুটকেশ, ডিঙিয়ে গেলো, তারপর জানালা খুলল।

সারা ঘর ধুলোয় ধুসর। ওপাশে তিনটে তোরঙ্গ—জং ধরা—ওপর ওপর থাক দেওয়া রয়েছে। দেওয়ালের র‍্যাকে কিছু বইপত্তর, কিছু কাগজ টাগজ। একটা চেয়ার, তার বসার জায়গাটুকু বেতের বুনুনী ছিঁড়ে গর্ত—কাত হ'য়ে আছে। চেয়ারের তলায় ভাঙা লাটাই।

সে উবু হয়ে বসল, হাত বাড়িয়ে টেনে আনলো লাটাইটা। কিছু সুতো ধুলোয় ময়লায় বিবর্ণ। সে আলতো হাত বোলালো, সহসা ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

র‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেলো, একটা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটালো—সরল ভূগোল—ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য—একটা এরোপ্লেনের জলছবি। এটাও সে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। দুমদাম করে জানালা বন্ধ করল। প্রায় ছুটে বেরিয়ে এসে দড়াম করে বন্ধ করল দরোজা. শেকল দিলো। ছাদের পাঁচিলে বুক ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো, নীচে রাস্তার দিকে তাকালো।

(বাবা বাজার করে ফিরছেন। বাবার চেহারাটা কেমন ঝুয়ে গেছে। আমি ইচ্ছে করলেই বাজারটা করতে পারি। কিন্তু অতো কম টাকায় আমি বাজার করতে পারি না—দুশ বেতন—একশ উচ্ছে আর ছোট ছোট চারা মাত্র—কিন্তু বাবার পেন্সনের টাকা, আর নীচে দুঘর ভাড়াটের দু'শ টাকা ভাড়া এইতো সম্বল। এখনও ছোটুর বিয়ের জন্য—

হাঃ! এখন আমাদের বাড়ীটা একটা অলসদের বাড়ী। আমাদের বাড়ী কেউ অফিস যায়না, কেউ কলেজ যায়না, কোনো ব্যস্ততা নেই। ছোটুও গত বছর বি. এ. পাশ করে কলেজের পাট চুকিয়েছে। এখন ছাই-পাঁশ গল্পের বই পড়ে, সেলাই বোনা করে, গান করে, মায়ের হাতে হাতে ঘরের কাজ করে, আর অপেক্ষা করে—কবে কারা দেখতে আসবে—যদি পছন্দ হয়, যদি দেনাপাওনা ঠিক হয়, তবে বিয়েটা হ'য়ে গেলে শান্তি!

ছিঃ! ছোটুটার একটুও আত্মসম্মান নেই। কেউ দেখতে এলে এমন সেজেগুজে চাঁদপানা মুখ করে বসে!

ধুস্ শালা! আমি নিজে কি? আমিতো আরও খারাপ। ছোটুকে

তবু বাড়ীতে দেখতে আসে, আর আমি যে শালা হাংলার মতো দোরে দোরে ঘুরি—কোথায় দয়া করে একটা চাকরি দেবে। ছ্যাঃ! ছ্যাঃ!)

ফাল্গুনের রোদের উত্তাপ আস্তে আস্তে তাকে ঘিরে ধরছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ঈষৎ ঘেমে উঠেছে। হাতের উল্টো দিক দিয়ে ঠোঁটের ঘাম মুছলো, একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, আর ঠিক তখন সে দেখলো নীচে রাস্তা দিয়ে ইন্দু অফিস যাচ্ছে।

সে দ্রুত নেমে আসছিল সিঁড়ি দিয়ে (কাল রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে যে আইডিয়াটা মাথায় এসেছে...) নিজের ঘরে ঢুকলো। পাজামা ছেড়ে প্যান্ট পরল। (আহ্! রামের এই প্যান্টের কাপড়টা সত্যি কি সুন্দর। এই প্যান্টটা আমাকে কি চমৎকার মানায়! বেশ করেছি আমি এটা নিয়ে নিয়েছি। উঃ! চারুদাকে এখনও প্যান্টের মজুরী দেওয়া হয়নি। আঠাশ টাকা চেয়েছে, কি করে ম্যানেজ করি!) গেঞ্জীটা গায়েই ছিলো—বুশসার্ট গলিয়ে নিলো, তোয়ালেতে বারকতক মুখ ঘষলো।

পাশের ঘরে এলো সে। এটা ছোটুর ঘর। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি চুল আঁচড়ালো, পাউডারের পাফ্ মুখে গলায় বোলালো, আয়নায় দেখে দেখে রুমাল দিয়ে ভালো করে মুখ মুছলো।

—কি ব্যাপার রে দাদা? তুই পাউডার মাখছিস?

সে চমকে উঠল, তারপর সামলে নিয়ে গম্ভীর গলায়—'কেন পাউডার কি তোর একা মাখার জিনিষ? তোর চেয়ে আমার রঙ অনেক ফরসা। আমাকে যে পাউডার মেখে ফরসা হতে হয়না। তবু গরম পড়েছে, ঘাড়গলা ঘামছে তাই একটু।'

—তুই ফরসা আছিস তো আছিস্, তবে ছেলেদের অতো ফ্যাটফ্যাটে ফরসা রঙ মেয়েরা মোটেই পছন্দ করেনা যাঃ—(ছোটু গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলো

সে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। (...অফিস টাইমে চৌমাথার মোড় থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত কয়েকটা স্পেশাল বাস যাতায়াত করে, ইন্দু নিশ্চয়ই ঐ বাসে অফিস যায়...)

ষ্টাণ্ডে দুখানা বাস পরপর দাঁড়িয়েছিল। পেছনের বাসটা খালি খালি। সে আড়চোখে দেখে নিলো পেছনের বাসে ইন্দু বসে আছে, উঠে পড়ল।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল সে ঠিক ইন্দুর উল্টো দিকে একটা সীট খালি, বসে পড়ল। বসেই ইন্দুর সাথে চোখাচোখি। সে মুখটা হাসি হাসি করল, দেখল চোখে চোখ পড়লে ইন্দুর চোখের পাতা যেরকম কেঁপে যায় সেরকমই কেঁপে গেল, তথাপি ইন্দু চোখ তুলে চাইল আর অল্প হাসল। একটা লোক তার সামনে রড ধরে দাঁড়াল—ইন্দু আড়াল—সে দাঁত খচখচিয়ে মনে মনে লোকটাকে শালা বলল।

ক্রমশঃ লোকের ভীড় বাড়ছিল। বাড়তে বাড়তে একসময় জমজমাট। বাস ছাড়ল কিন্তু ইন্দুকে সে আর দেখতে পাচ্ছিল না। ডালহাউসি স্কোয়ার থেকে ভীড় কমতে কমতে বাস যখন 'মিশন রো' পেরিয়ে গেল তখন বাস প্রায় ফাঁকা, কিন্তু ইন্দু কখন বাস থেকে নেমে গেছে।

ধর্মতলায় বাস পৌঁছাল। ময়দানের কিনারায় শহীদ মিনারের পাশে এসে বাস চুপচাপ হ'য়ে গেলে সে নামল, বটগাছের নীচে সিগারেটের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে ধরালো। মেজাজী হাওয়া দিচ্ছিল। সিগারেটে টান দিতে দিতে সে আবার বাসে উঠে বসল। বাস ফিরতি যাত্রার তোড়জোড় করছিল।

[দুই]

টুইশনির প্রথম পর্যায়ে—অর্থাৎ কিনা প্রথম কয়েকদিন সবে যখন অনুপমকে সে পড়াতে শুরু করেছে তখন একদিন এরকম চাপা কথাবার্তা শুনে ফেলেছিল যে ইন্দুর মা ইন্দুকে বলছেন—সন্ধ্যা সাতটার সময় এই চায়ের ঝামেলাটা তুই আবার জড়াচ্ছিস কেন? রান্নায় অসুবিধা করিস। ইন্দু বলেছিল—তুমি পারোতো মা, এটুকু একটু সামান্য ভদ্রতা।

রোজ সন্ধ্যায় পড়াতে গেলে সুন্দর কাপ প্লেটে চা আসে, আর নোনতা বিস্কুট। ইন্দু নিজে হাতে চা নিয়ে আসে। পড়াতে পড়াতে একদিন চোখ তুলে তাকাতে চোখে চোখ, সে দেখেছিল ইন্দুর চোখের পাতা কেমন কেঁপে যায়। অন্যদিনের মতো আজকে সে ইন্দুকে টেবিলে চা রাখতে দিলনা, আগেই হাত বাড়িয়ে দিলো এবং কয়েক মুহূর্ত চোখের ওপর চোখ রাখল। তারপর—

—আচ্ছা বাসে আজকে গেটের কাছে কি নিয়ে গণ্ডগোল হচ্ছিল

বলোতো ? তুমিতো দরজার পাশেই ছিলে, আমার সামনে এতো ভীড় ওদিকে কি হচ্ছে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না—কথা বলার সময় সে সারাক্ষণ ইন্দুর চোকে চোখ রাখল।

অফিস থেকে ফিরে ইন্দু টানটান করে চুল আঁচড়ে এলো। খোঁপা বেঁধেছে। শ্যামলা রংএ হালকা পাউডারের প্রলেপ। লাল আর কমলা মেশামিশি ডুরে তাঁতের শাড়ী। গলায় সরু একটা চেন। চেনটা কণ্ঠার হাড়ের হালকা আভাসের ওপর বাঁক নিয়েছে। চেনটা দুআঙুলে খুঁটতে খুঁটতে ইন্দু বলল—বাসে ওরকম গোলমাল অফিস টাইমে রোজই হয়, ওসব কেউ কান পেতে শোনে নাকি ! কিন্তু আপনি ওসময় কোথায় যাচ্ছিলেন ?

সে একপলক স্থির তাকিয়ে রইল, বলল, কেন আমি বুঝি অফিস যেতে পারিনা ?

ইন্দু অপ্রতিভ হ'য়ে বলল, তা কেন, আপনি চাকরি পেলে সে তো খুব সুখের কথা। তারপর দৃষ্টি উজ্জ্বল করে বলল, সত্যি আপনি, চাকরি পেয়েছেন ?

সে মৃদু হাসল। বলল, তোমার মতো ভাগ্যের জোর আমার নেই যে তুম করে চাকরি পেয়ে যাবো। তবে কিছু কিছু করুণা দয়া এসব মাঝে মাঝে জুটে যায়। এইতো দেখনা তোমার দয়ায় আমার টুইশনি—খুব মৃদু গলায় কথাটা বলল সে।

মোটেই না, আপনি কিছুতেই এসব বাজে কথা বলবেন না—ইন্দু ক্ষুব্ধ হ'য়ে কি বলবে যেন ঠিক করতে পারছে না এরকম মনে হচ্ছিল—এটা ঠিক কথা যে আমি আমার ভায়ের জন্য ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু আপনাকে—সে মুখ থমথমে করে থেমে গেল।

—দেখতো তোমাকে রাগিয়ে দিলাম ! সে হাসি হাসি মুখে বলতে চাইল এবং—অনুপম অফটায় কি তুমি আটকে গিয়েছ ? এদিকে তাকিয়ে আছ ?

খালি কাপটা সে ইন্দুর দিকে বাড়িয়ে দিলো, বলল, রাগ কোরোনা প্লীজ, আমি কি বলতে কি বলেছি। সে চেয়ারে বসে ইন্দু দাঁড়িয়ে, অনেকটা মুখ তুলে সে কথা বলছিল এবং এসব বলার সময় তাকে করুণা প্রার্থীর মতোই লাগছিল।—কোন এক অফিসের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আমাকে একটা চাকরির আশা দিয়েছেন, তার মানে এই দয়ামায়া করুণা ইত্যাদি

ব্যাপার, সেই কথাটাই বলতে গিয়ে অন্য সব আজেবাজে কথা এসে গেল।

একদিন রবিবার বিকালবেলা ছোটু বলল—এই দাদা তোর জন্য একটা চাকরি এখন আমার হাতে জানিস্? মাইনে অবশ্য কম, মোটে চল্লিশ টাকা, কিন্তু কাজটাও মাত্র একদেড় ঘণ্টার, বল্‌তো কি?

—লক্ষ্মীপুজো—সে ছোট্ট উত্তর দিলো।

—তুই চলে যাচ্ছিস? আমার কথার গুরুত্ব দিলিনা?

—সব সময় ফচ্‌কেমি ভাল লাগে না। সে থমকে দাঁড়িয়ে বলল—ফচ্‌কেমি নয়, সত্যি সত্যি—ছোটু দুগালে দুহাত দিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসলো—ওমা কি বলবো, তোমার মনিব কিন্তু 'লেডি' অর্থাৎ কিনা মহিলা। নিজে আমাকে বলল তোর জন্য, কি ব্যাপার রে দাদা তোকে একেবারে ঘরে নিয়ে যেতে চাইছে?

—আঃ! সে আবার বেরিয়ে যাচ্ছিল ছোটু হাত ধরে ফেলল, বলল, সত্যি সত্যি সত্যি, আজকে ইন্দু এসেছিল, বললো আজকাল আর তোর সঙ্গে দেখাই হয়না। ইন্দুটা কি 'লাকি', পাশ করে কোথায় কিছু নেই চুপিচুপি চাকরি আরম্ভ করেছে। ভাল চাকরি। ওর কোন সম্পর্কের কাকা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বাঙালদের সব কাকা খুড়ো মামা হাজার গণ্ডা থাকেও বাবাঃ!

—তোর এই স্বভাব গেলনা,—সে বিরক্তিসূচক শব্দ করল,—কি বলবি সেটা না বলে কোথা থেকে কোথায় চলে গেলি। তাছাড়া খামোকা তাকে বাঙাল ফাঙাল বলছিস্ কেন?

—সে কি রে দাদা?-ছোটু আবার দুগালে হাত দিয়ে হিঃ হিঃ।—চাকরি না পেতে পেতেই মনিবের হয়ে গাইতে লেগেছিস?

—তোরই তো প্রাণের বন্ধু, অথচ তোর হিংসা করতে লজ্জা করেনা? ও একচান্সে পাশ করল, তুই পারলিনা, আবার চাকরি পেয়েছে বলে বাঙাল কাকা খুড়ো এইসব যাচ্ছেতাই বলছিস্।

—উঃ, মনিবের প্রতি কি টানরে। তা তুই কি এক্ষুণি চললি নাকি মনিবের বাড়া?

—তোর সঙ্গে আমার কিচির মিচির করবার সময় নেই, আমার কাজ আছে—সে গম্ভীর গলায় বলল।

—আহারে! কি কাজের লোকরে! এখনতো বাবা পঙ্কুর দোকানের সামনে গিয়ে বকে একপা তুলে দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে—ছোট্ট মুঠো করে সিগারেট টান দেওয়া এবং তুড়ি দিয়ে ছাই ঝাড়ার ভঙ্গী করে বলল—কাজের মধ্যে এইতো? যাক্‌গে শোন, ইন্দু বলছিল—ভাই আমার লেখাপড়ায় ভালোই কিন্তু বাবা টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারেনি বলে টিউটর রাখা যায়নি, তোর দাদা যদি ভাইকে পড়ায়, ওর পড়াশোনা ভালো হচ্ছেনা—কিন্তু দাদা —ছোট্ট চোখ বড়ো বড়ো করল—তোর কথা বলার সময় ওর এমন চোর চোর মুখের ভাব হচ্ছিল কেনরে?

—চুলোয় যাক্ তোর চোর চোর ইন্দু! আমি এখন টুইশনি করছি না।

—করছিস্ না, না পাচ্ছিস্ না? সব টিউশনি তো একে একে চলে গেল। যা সব সাজো পাজো বন্ধু বান্ধব জুটিয়েছিস্! ওদের সঙ্গে তোকে আর কেউ আলাদা করে দেখে না যে ভালো ছেলে বলে তোকে ছেলে মেয়ে পড়াতে দেবে। যাঃ! যাঃ! আমার বন্ধু খুব খু-ব ভালো বলেই তোকে—ছোট্ট দুম দুম করে পা ফেলে চলে যায়—সে ডাকে আরে শোন্‌না তুই এতো রাগ করছিস কেন?

অঙ্কের জটিলতা বিশ্লেষণ—কিছুই ভাল লাগছিল না তার।

—অনুপম, অঙ্ক আজকে থাক—তুমি অন্য কিছু নাও—বাংলা—সেই ব্যাখ্যাটা লিখে ফেলে.—ঐ যে কালকে যেটা অসুবিধা লাগছিল। (নিজেকে কেমন ভেড়ুয়া মনে হয়···ভেড়ুয়া মানে ঠিক কি? কথাটা অনেকেই ব্যবহার করে। অথবা এভাবে বলা যেতে পারে পুরুষ যেমন রক্ষিতা রাখে আমার ক্ষেত্রে সেই ধরণের কিছু অর্থাৎ কিনা আমি একটি মেয়ের রক্ষিত? অবশ্য এতো অশ্লীল ভাবে চিন্তা করাটা ঠিক নয়···কিন্তু ব্যাপারটার সঙ্গে যখন টাকা পয়সা জড়িত তখনও এরকম একটা চিন্তাকে অস্বীকার করা—এটা সহ্য করতে পারা যাচ্ছে না। আমি যেন একটা রাস্তার কুকুর—শালা বিস্কুট নাকি বাসি রুটির টুকরো নিয়ে তু করে ডাকলে···)

অনুপমদের বাড়ী থেকে সে বেরুনোর সময় ঘড়ি দেখল—আটটা পঁচিশ।

গলিটা বেশী চওড়া নয় এবং আলোও যথেষ্ট বেশী নেই। কয়েক পা এগোতেই সামনে মূর্তিমান তিনজন।

—'এই যে—নবাব—পালিয়ে যেড়াচ্ছ কেন ?'

সে চমকচকিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত লাগল প্রকৃতিস্থ হ'তে। তারপর গম্ভীর ভাবে—'কেন ? পালিয়ে যেড়াবো কেন ?'

—'কেন ? মধু বলল, 'তাহলে তোমার টিকি দেখা যাচ্ছে না কেন ?'

—'যাচ্ছে না তো যাচ্ছে না। আমার ইচ্ছা হয় না যেতে তাই যাই না।'

—'কিন্তু ইচ্ছাটা হঠাৎ এখন হচ্ছে না কেন ? হঠাৎ এখন আমাদের সঙ্গে তোমার ভাল লাগছে না কেন ?—' রাগ থাকলে মধু তুমি বলে—তুই বলে না—'হাত ঘড়িটা আড়াইশো টাকায় বিক্রি করে দিয়েছ বলে ?'

—'মাত্র আড়াইশো টাকায় তুই ঘড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিস ? জানিস্ ওটার দাম কতো ? সাতশো টাকা !'—অনিল মধুর পেছন থেকে বলল। অপরিসর গলিতে ওরা পাশাপাশি দাঁড়াতে পারছিল না।

—'ঘড়ি আমি বিক্রি করিনি। হারিয়ে গেছে।'

—আলবৎ বিক্রি করেছিস্, আর কাকে করেছিস্ তাও আমরা খোঁজ পেয়েছি।

একটুক্ষণ চুপচাপ। কেউ কোন কথা বলছিল না।

—'না আমি বিক্রি করিনি !' দৃঢ় গলায় সে বলল। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে মধুর এক ঘুষি এসে পড়ল চোয়ালে। সে বুঝতে পারছিল তার ঠোঁটের পাশ কেটে গেছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে ঠোঁটের কোল দিয়ে। তার শরীরে রক্ত স্রোত দ্রুত হয়ে উঠল, মাথার প্রতিটি চুলের গোড়া চিন্‌চিন্ করছিল। সে একটা ঘুষি চালালো। কিন্তু মধু তৈরী ছিল—খুব একটা জোরে আঘাত লাগল না। কিন্তু এখন তার ওপর চড় ঘুষির বৃষ্টি হচ্ছিল এবং সেটা একা মধুই চালাচ্ছিল। একটা ঘুষি এসে পড়ল পেটে—সে যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে উঠল, পড়ে যেতে যেতে সে পেছনে শুনতে পাচ্ছিল ইন্দুর অসহায় আর্তনাদ। সম্ভবতঃ ইন্দু ছুটে আসছিল।

'—তোমাকে পনেরো দিন সময় দেওয়া হ'লো চাপা গলায় মধু বলল—'এর মধ্যে সব পাওনা আমাদের মিটিয়ে দেবে', বলতে বলতে ওরা চলে যাচ্ছিল।

ইন্দু ও অনুপম তাকে দাঁড় করালো। পেটের নীচে যন্ত্রণা। সে তাকিয়ে দেখল ইন্দুর মা বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে।

—'কি হয়েছিল কি ?' ইন্দু ব্যাকুল গলায় বলল।

—'কিছু না, কিছু না', হতাশ স্বরে বলল সে, এগিয়ে যেতে চাইল।

—'আপনি একটু ঘরে এসে বসুন', ইন্দুর অনুরোধে আকুলতা—'আপনাকে মোটেই সুস্থ লাগছে না, 'মাগো! গালের পাশটা কেটে গেছে'! ইন্দু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এইসব ছেলেদের সঙ্গে আপনি মেশেন?

—'মিশি না', মৃদু গলায় বলল সে, 'এককালে বন্ধু ছিল, স্কুলে কলেজে একসঙ্গে পড়েছি।'

—'চলি, আমি চলি, সে একপা এগোলো।

—'কিন্তু, আবার যদি ওরা আপনাকে মারে?'

—'না,' সে হতাশ ভাবে বাঁ হাত নাড়ল। ইন্দু তার ডান হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিল, ছাড়িয়ে নিতে গেলে জোর লাগল।

(আমার মায়ের কাছে তোমরা অনেক ভালবাসা পেয়েছ, অনেক আদর, আর আমি—আমার কাছ থেকে তোমরা অনেক পেয়েছ অনেক নিয়েছ তবু—)

সে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছল। হাঁটতে কষ্ট লাগছিল, পেটের কাছটা চিন্‌চিন্ করছে।

গলিটা এভাবে কষ্ট কষ্ট পায়ে শেষ করে সে যখন বাঁক নিচ্ছে কি ভেবে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, দেখল দূরে ইন্দু দাঁড়িয়ে আছে। ওর চারিদিকে আবছা অন্ধকার, কিন্তু খোলা দরোজা দিয়ে ঘরের চৌখুপি আলো বাইরে, সেই আলোর মধ্যে ইন্দু দাঁড়িয়ে।

[তিন]

পরের দিন—তাদের বাড়ীর এলাকা পেরিয়ে ইন্দু অনেকটা এগিয়ে গেলে সে বাড়ী থেকে বেরুলো, অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে সে হাঁটছিল। বাস ষ্ট্যাণ্ডে পৌঁছে গেল ইন্দু, বাসে উঠল, সে দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে। বাসে ক্রমশঃ ভীড় বাড়ছে এবং এক সময় বাসটা ধীরে চলতে আরম্ভ করল। সে দ্রুত এগিয়ে এলো পেছনের গেটে কোনরকমে উঠল।

...ইন্দু যেন যেন আমাকে দেখতে না পায়। হে ভগবান ইন্দু যেন আমাকে দেখতে না পায়। দেখতে পাবেই বা কি করে? ওতো উঠেছে সামনে, বসেছেও নিশ্চয়ই। কোথায় বসেছে আমিই তাকে দেখতে পাচ্ছি না তো।

ও আমাকে দেখবে! এতো ঠাসাঠাসি ভীড় তবু সাবধান থাকা ভালো…

কিন্তু ইন্দুকে আমায় দেখতে হবে যে। লক্ষ্য রাখতে হবে ও কোথায় নামে…।

কিন্তু এ আমি কি করছি? হে ভগবান, এ আমি কি করছি? এই যে মতলব আমি কয়েকদিন ধরে বুকের মধ্যে পুষছি এটা কি করছি আমি? ইন্দু, ইন্দু তুমি আমাকে ভালবাস। আঃ আমি জানি ইন্দু সে ভালবাসা অনেক গভীর। কাল রাতে আমি সেটা মর্মে মর্মে বুঝলাম। তবু ইন্দু আমি তোমাকে…।

আঃ! ইন্দু কেন তুমি আমাকে ভালবাসলে? আমি খুব খারাপ। আমি নীচ হ'য়ে গেছি ইন্দু। হাঁ। এককালে আমি হয়তো ভালো ছিলাম… তখন আমার চারপাশে সব কিছু অন্য রকম ছিল, কিন্তু সেই 'অন্যরকম কিছু' দিন দিন জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, বদলে এসে জুটছে কি যেন সব কাঁকরের মতো. আর আমি দিন দিন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছি…

বাসের পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দরজায় নজর রাখছিল। ব্রাবোর্ন রোডের সেবাসেবি ইন্দু নামলে সে নেমে পড়ল এবং একটু তফাৎ তৈরী করে নিলো। অল্প একটু হাঁটার পর ইন্দু বিশাল একটা অফিস বাড়ীর দরোজার ভেতর অদৃশ্য হ'য়ে গেলে সে চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ফুটপাথে, তারপর পাশের সিগারেটের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে ধরালো।

(মাত্র পনেরো দিন সময়…ঘড়িটা বন্ধক দেওয়া আছে আড়াইশো টাকায়…সুদ আরও গোটা কুড়িটাকা—মধুর একশো টাকা…রামের প্যাণ্টের কাপড়ের দাম—শ' খানের হবে…শ'পাঁচেক টাকা মোট চাই—মাত্র পনেরো দিনে। না হ'লে? কি হবে? আমাকে খুন করবে? আমি শালা জানের পরোয়া করি না যাঃ। আর তোদেরও অতো মুরোদ নেই। কিন্তু…কিন্তু ক্রমশঃ সবাই জানবে…দশ বিশ টাকা আমি আরো অনেকের কাছে নিয়েছি …এইতো চারুদাকেই এখনো প্যাণ্টের মজুরী দিইনি। সবাই আস্তে আস্তে আমাকে চিনে ফেলবে। তারপর? যখন মা শুনবে? বাবা শুনবে? তখন?)

সে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো, তারপর দ্রুত হাঁটতে থাকল। (যেভাবেই

হোক আমাকে এই ফাঁস থেকে মুক্তি পেতে হবে···আজ বিকেল পাঁচটায়—ঝুটো ভাবনা সব সরে যা। আমার মতলব মতো কাজ করতেই হবে)

তার বাড়ী ফেরার একটা বাস—সে দ্রুত রাস্তা পেরুল।

বিকেল পাঁচটার সময় সে একই জায়গায় এসে দাঁড়াল। ফিটফাট পোষাকে তাকে আকর্ষণীয় উজ্জ্বল লাগছিল। হাতে একটা আফস খাম, ভেতরে কিছু কাগজপত্র আছে বোঝা যায়। খামটা সে এহাত ওহাত করছিল। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ইন্দুর অফিসের দরোজার দিকে, মাঝে মাঝে সে অস্থির ভাবে ঠোঁট কামড়াচ্ছিল। অনেক লোকজন দরোজা দিয়ে বেরুচ্ছে, দু চারজন মহিলাও, তাঁদের ফাঁকে ইন্দুকে দেখতে পেল সে।

বাইরে এসে ইন্দু কিন্তু বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে না এসে দক্ষিণমুখে হাঁটা শুরু করল। সে একটু ইতস্ততঃ করল তারপর রাস্তা পেরিয়ে হাঁটতে থাকল এবং ইন্দুর কাছাকাছি এগিয়ে এলো।

রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এর কোনে এসে ইন্দু থামল। সামনে রাস্তা—অজস্র গাড়ির স্রোত—সে দ্রুপা এগিয়ে ইন্দুর পাশে এসে দাঁড়াল, বলল 'এই ইন্দু'।

ইন্দু একটু চমকে ফিরে তাকাল এবং তার দৃষ্টি সহসা উজ্জ্বল, বলল, আপনি? একটুক্ষণ তার মুখে স্নিগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'ভাল আছেন? আমার কিন্তু খুব ভাবনা হচ্ছিল, খারাপ কিছু হ'লো কিনা।'

সে ইন্দুর মুখ দেখল, রুখু রুখু কিছু চুল কপালের আশেপাশে, মুখটা শুকনো শুকনো ক্লান্ত, 'না কিছু হয়নি' বলল সে 'কিন্তু আমার টুইশনি আজ থেকে বন্ধ হ'য়ে গেলতো?'

—কেন? ইন্দু অবাক চোখে তাকায়।

—এরকম একজন বাজে ছেলেকে নিশ্চয় কেউ টিউটর রাখতে চায়না?

—খারাপ সংগীদের এড়িয়ে চললেই হয়। ইন্দু গম্ভীর গলায় বলল।

আলোর সঙ্কেত পরিবর্তিত হয়েছে, সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। থমকে থাকা লোকজন রাস্তা পার হচ্ছে, ইন্দু পা বাড়ালো। পাশাপাশি পা ফেলতে ফেলতে সে বলল, 'আহা, সেটা তো পরের কথা, এখন চাকরিটা আমার থাকছে না যাচ্ছে?'

—থাকছে।

রাস্তা পেরিয়ে তারা লালদিঘীর এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। একটা

বটগাছের ডালপালার জটলা তারা ছড়িয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ হাওয়ার ঝাপটা আসছিল এবং দুএকটা শুকনো পাতার ওড়াউড়ি। একটা শুকনো পাতাকে সে ব্যাটমিন্টনের ককের মতো হাতের খামটা দিয়ে আঘাত করল। ইন্দুর মাথায় প্রায় লাগছিল বলে, মাথাটা দ্রুত নীচু করে নিয়ে সে সচকিত তাকাল।

সোঁ সোঁ শব্দে একটা ট্রাম আসছে, সুতরাং তারা ট্রামলাইন পেরিয়ে গেল। এখন দিঘীর রেলিংএর ধার ঘেঁষে তারা হাঁটছিল।

—সেই চাকরির কি হ'লো ইন্দু বলল।

—সেই খোঁজেইতো গিয়েছিলাম—সে হাতের খামটা নাড়াচাড়া করল, একবার ইন্দুর মুখ দেখল, একবার দূরে ডাকঘরের বড় ঘড়ি, টেলিফোন ভবনের মাথার ওপর মাডার, বলল 'ওটা হওয়া সম্ভব নয়।' একটু থেমে—হ'তে পারত কিন্তু তাহলে ওনাকে শপাঁচেক টাকা ঘুষ দিতে হয়। সোজাসুজি নিজে চাইছেন না, খালি ঘোরাচ্ছেন ঘোরাচ্ছেন, আমাকে অপর একজন বলল। সে এখন মুখ নীচু করে হাঁটছিল, খুব আস্তে আস্তে।

—আমার বাবা খুব ভালো চাকরি করতেন, কিন্তু বাবা খুব খরুচে। ভালো মাইনে পেয়েছেন ভালো হাতে খরচও করেছেন। ভালো খাওয়া দাওয়া, পোষাকআশাক আসবাব পত্র। তাছাড়া আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের জন্য করেছেন, বছর বছর বেড়াতে বেরিয়েছেন—সুতরাং সঞ্চয় কিছুই নেই। এইসব কথা ভাবলে বাবার জন্য আমার মন কেমন করে।

দিঘীর ঘাটের কাছে বন্ধ গেট, সে দাঁড়িয়ে পড়ল। গেটের রেলিঙ ধরে পশ্চিমে রক্তিম আকাশের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল। ইন্দু ওর কাছে সরে এসে দাঁড়াল।

—বাবার কাছ থেকে আমিও এই স্বভাবটা দেখছি পেয়ে গেছি—সে একটু বিষন্ন হাসল।—যাই হোক বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়ে লাভ নেই, মাঝখান থেকে বাবার মন খারাপ হবে। বাবা এখন অল্প টাকায় সংসার চালান, বাজার করতে গিয়ে তাঁকে যে কি পরিমাণ সংযত থাকতে হয়—এক সময় খোলা হাতে খরচ করেছেন—যাকগে ওসব কথা ছেড়ে দাও, —সে ইন্দুর মুখের দিকে তাকাল, চোখে চোখ ফেলল।

ইন্দু ঈষৎ ঘাড় তুলে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, চট করে মুখ নামিয়ে নিলো।

—আমরা এ'দিকে হাঁটছি কেন আমি কিন্তু বুঝতে পারছিনা, সে বলল।

—ইন্দু বলল, এদিকে আমি রোজই হাঁটি। ধর্মতলার ওদিকে এগিয়ে গেলে তবে বাসে উঠতে পারি বা বসতে পারি।

—অফিস থেকে বেরিয়ে রোজ তুমি এতোটা হাঁটো?
গলায় বলল।

—তাতে কি, ইন্দু যেন দোষ কাটাতে চাইছে এভাবে বলল, 'সারাদিন-তো বসে বসেই কাজ, বিকালে একটু হাঁটা ভালো।'

—'হুঁ।' ভালো!' সে যেন ইন্দুর দোষ কাটানর চেষ্টাটা ধ'রে ফেলেছে এভাবে বলল, এবং হাঁটতে শুরু করল।

লালদিঘীর এলাকা পেরিয়ে আবার রাস্তা আবার গাড়ীর স্রোত। পুলিশ হাত তুলল, তারা রাস্তা পার হচ্ছিল, সে আলতো আঙুলে ইন্দুর বাহু ছুঁয়েছিল, যেন ইন্দুকে সাবধানে রাস্তা পার করাচ্ছে।

—ইন্দু আমি জানি, তুমি আমাকে ভালবাস, সে চুপিচুপি বলল। তারা রাস্তার ঠিক মাঝখানে ইন্দুর পা কেঁপে গেল।

রাস্তা পেরিয়ে এসে সে ইন্দুর মুখ দেখল—কপালে ও ঠোঁটের ওপর ঘাম, ইন্দু মুখ নীচু করে হাঁটছিল।

অনেকটা সময় কেউ কোনো কথা নেই। একসময় সে আস্তে ডাকল—ইন্দু—কিন্তু কোন সাড়া মিলল না।

—ইন্দু, আমি কি অন্যায় করলাম? সে ব্যাকুল গলায় বলল। ইন্দু ভীতুর মতো ঘাড় নাড়ল, অস্ফুট গলায় বলল—না—না।

আবার চুপচাপ হাঁটা। এলোমেলো হাওয়ায় ইন্দুর আঁচল উড়ছিল, ও কাঁধের ওপর দিয়ে আঁচল বেড় দিয়ে নিলো।

—'একটা বাস আসছে,' সে বলল, ইন্দু চোখ তুলে বাস দেখল, তারপর ফুটপাথ থেকে রাস্তায়।

সে হাত তুলল বাস দাঁড়াল, ইন্দু যখন বাসের পাদানিতে, সে অভিমানী গলায় বলল, 'তুমি যাও আমি যাবোনা।'
চকিতে ইন্দু ঘাড় ফেরাল, তখন বাস ছেড়ে দিয়েছে, ইন্দুর চোখে চোখ পড়তে সে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

[চার]

তিনদিন সে পড়াতে যায়নি। তিনদিন সে বাইরেও কোথাও যায়নি। সারাক্ষণ ঘরেই—শুয়ে, বসে, কিংবা বই পড়ে। সে যেন এক শান্ত ব্রত পালন করছিল।

আজ সকালেও সে শান্ত ভাবে চেয়ারে বসেছিল, এতো শান্ত যে তার বাহুতে একটা মাছি অনেকক্ষণ ঘাড় মুখ মুছছিল, সে নির্নিমেষ মনে তাকিয়ে দেখছিল। এসময় শাঁখ বাজার শব্দ।

(...আজ বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার সকালে মা পুজোটুজো করে···)

—অমিতদা, ভেতরে আসবো ?

সে ঘাড় ফেরালো, দরজায় অনুপম দাঁড়িয়ে। সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

অনুপম তার কাছে এলো, পকেট থেকে একটা খাম বার করল, বলল, দিদি আপনাকে চিঠি দিয়েছে, জানতে চেয়েছে, আপনার কি শরীর খারাপ ?

সে একটু ইতস্তত: করল, বলল হ্যাঁ।

—আচ্ছা। আপনি ভালো হ'য়ে গেলে পড়াতে আসবেন, আমি ঐ চ্যাপ্টারের সব অঙ্কগুলো করতে পেরেছি জানেন।—ঘাড় কাত করে অনুপম বলল।

সে মৃদু হাসল—তাই নাকি ? অনুপম যেন লজ্জা পেলো, বলল আমি যাচ্ছি, তারপর প্রায় ছুট।

বন্ধ খামের মুখ ছিঁড়ল সে—সহসা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, খামের ভেতর একটুকরো কাগজে চিঠি আর একশ টাকার কয়েকটা নোট।

আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, বিনা অনুমতিতে টাকা পাঠিয়ে হয়তো অপরাধ করছি। কিন্তু আমরা তো সকলে চাই আপনার চাকরিটা হোক, আপনার দিন ফিরুক। আমি বছর খানেক চাকরি করছি, বিশেষ সঞ্চয় আমার নেই, তবু যেটুকু ছিলো দিলাম, ঠিক আছে ধারই দিলাম, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি রাগ করবেন না ?

আপনি দয়া করে আমাদের বাড়ী আসবেন। আমার খুব খারাপ লাগে, খুব। আমার সেদিনের ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি, কিন্তু আমি জানি আপনি আমাকে ভালবাসেন না।

ইতি—প্রণতা, ইন্দু

ভূষিত

অজিত হাজরা

ছুটির সাড়ে নটায় জনপদ এমন নির্জন হয় না। প্রাপ্তবয়স্কদের অফিসবন্ধ দিনে কেনাকাটার এবং অপ্রাপ্তদের স্কুলবন্ধ দিনে খেলাধুলোয় ব্যস্ততা পথে-বিপথে থাকেই। কিন্তু আজ ঘরের বাইরে কয়জন হাতের আঙুলে গোণা যায়। এখন দশগুণ, ঘণ্টাখানেক পরে লু বইবে, তাই এই দুরবস্থা। অমল খেলা শেষ না হতে মাঠ থেকে বাসায় ফিরেছে। আজ অমলের মা-র অফিস ছুটি, তবু ও একা কারণ মা ঘরে থেকেও ঘরে নেই, বারান্দায় ঠায় দাঁড়িয়ে। আর অমলের বাবা মারা গেছেন, ভাইবোন জন্মায় নি।

অমলের মা কী যে দেখছেন!

রোদে পোড়া আকাশ; চিল, শকুন, এমন কি জেটপ্লেন ওড়ে না। আর পথ যে ফাঁকা একবার দেখলেই বোঝা যায়, পথের কুকুর পর্যন্ত পথে নেই। তবু অমলের মা ঠায় দাঁড়িয়ে, যদি চারচাকার বেগতিক ব্যাপার দেখা যায়, এই দুরাশায়। অমল ভেতর থেকে ডাকল—মা। মা ছেলের ডাক শুনতে পেল না। কত যে ভাবনা তাঁর। হঠাৎই মা-র মুখে হাসি ফুটল। একটি স্টীলের রথ বড় রাস্তা ছেড়ে ছোট রাস্তায় পা দিয়েছে। তিনি এসেছেন।

এখন জনপদের অবস্থা এইরকম। পুরবাসীজন যে যার ঘরে। আর কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলায় না। ছুটির দুপুর আলস্যে কাটাবার জন্যে সকলে দরজা জানালায় খিল দিয়েছে। পাখি ফিরে যায়। কোথায় যাবে ঠিক নেই, কেননা জনপদে ছায়াঘন বৃক্ষের অভাব। দূর মাঠে কতিপয় প্রাচীন সমাধিসৌধ ওরফে মকবরা; অবারিত দ্বার, হয়ত ছোটপাখি সেখানেই যাবে। সে যাক। যারা ঘরের গভীরে তারা সুখ ও শীতলতার জন্যে ফ্যান খুলে ভাবছে, কী করে রোজগার বাড়ানো যায়।

অমলের মা তাঁর অফিসের বস রবার ফোম সোফায় গুছিয়ে বসতে রুমকুলার খুলে যথাযথ নারীয়িক মানচিত্র মেলে দিলেন। অমল রান্নাঘরে, সবই বুঝতে পারে। সন্তর কাকু এসেছেন, মা-র এখন অনেক কাজ। যথার্থই তাই। চাকরীর উন্নতি বলে কথা।

আর জনপদে এখন এয়াররেড মহড়াকালীন সতর্কতা। ভরদুপুরে বড় অদ্ভুত লাগে। যাবতীয় বাড়িঘরের দরজা জানালা বন্ধ। মোড়ের গুমটিতে যে সকরুণ আওয়াজ দিচ্ছিল—কোকোকোলা, ফানটা, সে ঝাঁপ বন্ধ করেছে। নীচে যে জায়গায় বসে মুচি ছেঁড়াজুতো সেলাই করে, সে জায়গাটা প্রখর রোদে ধু ধু করছে। আর জায়গাটা একদম ফাঁকা, শুধু একটি প্রোথিত দণ্ড, যার সঙ্গে ছাতা বেঁধে সে ছায়া তৈরী করে। এখন যদি সেটি কেন্দ্র করে এক সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্ত রচনা করা যায়, দেখা যাবে সবটুকু ছায়া তার ভেতর, এমন সঙ্কীর্ণ ছায়া। আর বৃক্ষহীন রাস্তার লাইট পোস্টগুলি দেশলাই কাঠির মত জ্বলছে।

সময়টা বড় খারাপ, নাহলে অমলের মা গাল থেকে সঞ্জয়ের মুখের লালা মুছে অমলের ঘরে চলে আসবেন কেন? তিনি চাপাচাপা গলায় বললেন—অমল, তোমাকে যা বলেছি, মনে আছে তো? অমল হোমটাস্ক করতে করতে ঘাড় কাত করল। করতেই হয়। তারপর পড়ার টেবিল থেকে উঠে গিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে দেখল, কিছুই দেখার নেই। বাড়িঘর সব বন্ধ, পথবিপথ সব ফাঁকা। আর মাটি জ্বলে যায়। অমল পর্দা টেনে ফিরে এল পড়ার টেবিলে। পড়াশোনা ভাল লাগে না। খাতা বন্ধ করল, বন্ধুর কথা ভাবল, জোরে মাথা নাড়ল। নাহ্। শিশিরের কাছে যাওয়া চলে না। মাসীমা বিরক্ত হবেন।—দরজা বন্ধকরে দাও, বলে রাস্তায় পা দিল। চলছে। পা জোড়া কোথায় চলেছে জানে না। অত্যন্ত অন্যমনস্ক, কারণ পূর্বাপর সবই মনে পড়ে। বাবার মৃত্যুর পর সেই অফিসে মা-র চাকরী পাওয়া, মা-র অফিসে কাজ বাড়তে থাকা, মা-র বাসায় ফিরতে বিকেল থেকে সন্ধ্যে, সন্ধ্যে থেকে রাত হওয়া। আজ ছুটির দিনে সঞ্জয়কাকুর আসা। অমলের ষোলো বছরের কচি বুক মোচড় দেয়। মাগো। মা আমার।

ছুটির এইদিনে যখন সঞ্জয় অমলের মা-র কাছে, অমলের মা-র কাছে থাকা চলে না। ও পথেবিপথে হাঁটছে।

আকাশে মরুভূমি থেকে আসা আঁধির পূর্বাভাস। উত্তর-পশ্চিম দিকটা একটানা তামাটে। জনপদের যাবতীয় বস্তুর ওপর সূক্ষ্ম বালুকণা ঝরছে। বিরল গাছগাছালি মলিন হয়, মাঠের সব ঘাস মরে, ছোটপাখি দিশেহারা।

আর অমল হাঁটছে, যেমন বাবার পেছনে শবানুগমনকারীদের সঙ্গে নিগমবোধ ঘাট পর্যন্ত হেঁটেছিল। বাবার মরা মুখ চোখের সামনে। ওর খুব দুঃখ হয়, সেদিনও হয়েছিল, কিন্তু এমন নয়। এই দুঃখ তার নিজের স্বভাবে চীৎকার করে।···মাগো! তুমি এমন হলে কেন? কিন্তু কোন শব্দ হয় না, যা কিছু আওয়াজ বুকের ভেতর।

অমল এখন জনপদের প্রান্তসীমায়। এরপর শুধু ধূ ধূ মাঠ। আর মাঠের ভেতর মকবরা, যা অবারিত দ্বার। এ ছাড়া মাঠ ফাঁকা, এত ফাঁকা যে ভাবা যায় না। মাঠে পা দিতে অমলের তেষ্টা পায়, মনে পড়ে ভাত খাওয়ার পর জল খাওয়া হয় নি। সেই সময়ই সন্তর কাকু বাসায় আসেন আর তিনি এলে সবই ভুল হয়ে যায়, জল খেতেও মনে থাকে না। অমলের গলা শুকিয়ে আসে, জিভটাও কেমন কাগজ কাগজ, মুখে থুথু থাকে না। কষ্ট হয় অথচ কষ্টের ভেতর দিয়েই অমল হাসল, কেননা মা যা স্নেহময়ী মা-র মত বলেছিলেন, মনে পড়েছে।···অমল, তুমি শিশিরের কাছে যাও।

কিন্তু অমল মাঠের দিকেই পা বাড়াল। শিশিরের বোন কণা, তাকে মনে পড়লেও। বাবার মরা মুখ দেখে কী যে হয়েছে ওর। কিছুই ভাল লাগে না, কণাকেও না। এইরকম মনে হয় ওর: আমি কণার হৃদয়ের বাসভূমি দেখেছি। সে এক আশ্চর্য সুন্দর দেশ। কিন্তু আমি কী করে বলব —কণা, তুমি আমার মা হও।···অমল যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে একটা খাল। জল নেই বললে ভুল হবে কিন্তু তা দিয়ে তেষ্টা মেটানো যায় না, অন্ততঃ অমল পারে না। ও ফেলে আসা জনপদের দিকে তাকাল। বুক জোড়া তেষ্টা প্ররোচিত করছে ফিরে যেতে, যেখানে মা অথবা কণা সেখানে না হলেও যেখানে ফানটা অথবা কোকাকোলা সেখানে। সবাই তো যায়। বাজারের দিকে পা বাড়াতে অমলের মনে হল, ফার্স্ট সেকেণ্ড হওয়ার কোন মানে হয় না। বৃথা শ্রম। প্রগ্রেস রিপোর্ট সই করার সময় মা যা কিছু বলে, তা মা-র অনেক খরচ করে টিউটার রাখা নিয়ে, যেন বাদবাকী হবেই দুই আর দুইয়ে চারের মতন, না হয়ে পারে না। ওর কোন কৃতিত্ব নেই।

এখন ভূমণ্ডলের বায়ুস্তর কাঁপছে ঝিমঝিম, যেমন অলস্ত উনুনের ওপর কাঁপে। সকালে উত্তপ্ত হয়েছিল কঠিন মাটি, তারপর ধীরে ধীরে মাটি সংলগ্ন বায়ু। সেই বায়ু লঘু হয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে, ঊর্ধ্বের শীতলবায়ু যা অপেক্ষাকৃত গুরু

নেমে আসে। তাও উত্তপ্ত হয়। এভাবে লণ্ডভণ্ড কিছুই শীতল থাকে না।

রাস্তার পিচ গলগলে। তৃষ্ণার্ত অমল ভুল করে মনে করে দূরে রাস্তায় খানিকটা জল ছল ছল। ওর চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। তুরন্ত বায়ুর মতই বাবার স্নেহ প্রীতি ভালবাসা আলোড়ন সৃষ্টি করে, বুকের ভেতর। আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত, এরকম মনে হতে ধ্রুবের মত সংকল্প করল, ফিরবে না যেখানে বাবা নেই, শুধু মা। যে মা মনে করে ছেলেটার বাবা বেঁচে থাকলে খাওয়া, পোষাক, টিউশন এইসব জরুরী ব্যাপারে এত খরচ করতে পারত না। অভিমানে অমলের বুক টনটন করে।…মাগো! আমার মাছ মাংস, টেরিকটন, টেরিউল, টিউশন ফিউসনে দরকার নেই; আমি শুধু চাই, তুমি আমার মা থাকবে, যেমন শিশির কণার মা।…অমল জনপদে ফিরে আসে।

বাজারে অমল কানটা অথবা কোক পায় না। ভাবিত মুখ। এখন কী করা যায়? রোদের তাপ সহ্য করতে না পেরে ও দোকানবাড়ির ছায়ায় দাঁড়াল। কখনও মা কখনও কণাকে মনে পড়ে। ও মা-র দেওয়া পকেটমানি থেকে একটা নতুন দশপয়সা ছুড়ল ডিসকাস ছোঁড়ার মতন। সেটা পিচের ওপর চিটিয়ে থেকে চকচক করে। অমল আর একটা ছুঁড়ল হাতের টিপ পরীক্ষার জন্যে। আর কী যে ভাগ্য ওর, সেটা ঠিক লাগে। তখন ওর ভাল লাগে। আর শুধু কণাকেই মনে পড়ে। এভাবেই অমল কিছুক্ষণ দুঃখ ভুলে থাকে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। একটু পরই মনে হয়, কোথায় জল পাওয়া যায়? আবার হাঁটতে থাকে। শিশিরদের বাড়ীর চিলেকোঠা দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। কী ভাগ্য শিশিরের, অমন একটা মা। কোনরকমে পাস করে শিশির তাতেই মাসীমা রেজাল্ট বেরোনোর পর শুধু শিশির শিশির। আর কী যে গল্প করেন শিশিরের সঙ্গে বিভোর হয়ে।

অমল হাঁটতে পারে না। পা টলে। জল চাই জল। কলতলায় শূন্য কলসি বালতি, টিন এই সবের ভিড়। একটু দূরে চোট খাওয়া পাইপ পালটানো হচ্ছে। এখন কাজ বন্ধ। মেহনতী মিস্ত্রীরা রোদের তাপ সইতে না পেরে ছায়ায় বসে জিরোচ্ছে খোঁড়াখুঁড়ি করা জায়গাটার ধারে এনামেল করা বোর্ড খাড়া করে রাখা, লাল হরফে লেখা: সাবধান। অমল থমকে দাঁড়ায় যেন ওকে উদ্দেশ করে এই সতর্কবাণী। ও সরে এসে একজন মিস্ত্রীকে

জিজ্ঞেস করল—সারতে কতক্ষণ লাগবে? সে বলল—ঠিক নেই। যেহেতু ওরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছিল, অমলের দিকে প্রীতির চোখে তাকাচ্ছিল না আর মাত্র ছোট এক বালতি জল, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অমল জল চাইতে পারল না। যে পথে এসেছিল সে ফিরে যায়।

আবার জন পদের প্রান্তসীমায়। আশ্চর্য। অমলের জল না খেয়েও আপসে তেষ্টা কমে গেছে। কী করে যে যায়! এখন শুধু মনে করলে কষ্ট। কিছু নিয়ে ভুলে থাকলে কষ্ট হয় না। তেষ্টা ভোলার জন্যে অমল মিস্ত্রীর মুখে মাছের মরা নজর, দশপয়সার ওপর নির্ভুল দশপয়সা লেগে যাওয়া এইসব আকুলিবিকুলি মনে করে। আর অসমতল মাঠের ভেতর যতদূর সম্ভব দ্রুত হাঁটছে। অনেক কিছুই মনে করতে চেষ্টা করে। যেমন, এলজেবরার ফরমুলাগুলি, গ্রামারের নানা ডেফিনিসিন, জেনারেল নলেজের টুকিটাকি মনে পড়ে, মেরিনার নাইন, মঙ্গলগ্রহে ঘনীভূত কার্বনডাই অক্সাইডের নীচে জলস্রোত। সেই জল কী ঠাণ্ডা। হিমশীতল। আর অজ্ঞাতসারেই, যেমন কোন এক শরতের সকালে পড়ার টেবিলে বসে, শিশির কণার কাছে মন চলে যায়।

মাঠ পরিপূর্ণ নির্জলা। যা আছে, যেমন পাথর, কাঁটাভরতি ডাল, মরা ঘাস, উড়ে আসা পাতা সবই বিশুষ্ক, জলজ কিছুই নেই। আর বাতাসের হাহাকার ঘোরাফেরা করে—রসকষ বাঁচাও, না হলে কচিকাঁচাদের মরণ।

হয়ত অমল শুনতে পায়। যন্ত্রণাঘোর মনে পড়ে, মা-র নতুন কেনা ফ্রীজ ভাইনিং রুম ছুইং রুমে, যেখানে এখন মা আর সঞ্জয় কাকু। ফ্রিজের আইসকিউব মঙ্গলগ্রহের জলস্রোতের মতই অনেক দূর। হায়। অমল টলতে টলতে পৌঁছে যায় একটি প্রাচীন ছাতের নীচে। অনেক দিন পর এই ষড়ভুজ মকবরায়, যেখানে দায়াপুত্র নিয়ে কোন আমীর ওমরাহ গোরনিদ্রা দিচ্ছে, অমলের আসা। ও বালুময় মেঝের ওপর হাত পা ছড়িয়ে বসল মাথার ওপর গম্বুজের শূন্যতা, যার ব্যাস উঠতে উঠতে কমে যায়। সেখানে একটি ছোট পাখি।

আর অমল ছেলেমানুষের মত ছটা দেয়ালের ওপরনীচ খুঁজতে থাকে, কোথায় কণা ওর নাম খোদাই করে গেছে। অনেক ছেলের নাম অনেক মেয়ের নাম, তার মধ্যে সুন্দর হস্তাক্ষর—অমল কণা। অমলের লজ্জা করে।

যাকে তার মা ভরদুপুরে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয় সে কী শিশির কণার সমান হতে পারে? দারুণ ক্ষোভে অমল নিজের নামের ওপর বাস্ত হাতে পাথর ঘষতে থাকে, যতক্ষণ না বিলুপ্ত হয়ে যায়। হয়ে গেলে নিশ্বাস ফেলছে। যখন কণা এখানে আসবে আর আসবেই, কোথাও অমল নেই।

তারপর কী এক অভিমানী সঙ্কল্প নিয়ে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছে।···মাগো। আমি বুঝতে পেরেছি সঞ্জয় কাকু আমাকে দেখলেই তোমার বয়েসের কথা ভাবেন। কিন্তু আমি কত লুকবো নিজেকে। আর পারিনে।···অমল হোঁচট খায় তবু ওঠে।···মা, তুমি এবার নিশ্চিন্ত হতে পারবে। একদম ঝাড়া হাত পা। বাবাও নেই আমিও নেই। আর তুমি তো বলেই থাকো, মরা মানুষ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

সিঁড়ির খোলামুখে রোদ ঝলসানো আকাশ। অমল থমকে দাঁড়াল। চোখে হাত চাপা দিয়ে।···কণা, আমি জানি, তুমি আমার মা হবে, একথা মাসীমাকে বললে ভাল শোনায়। কিন্তু লজ্জায় বলতে পারিনে। মাসীমা তো শিশিরের মা। আর জানো কণা, আমার মা খুব স্নেহময়ী মা-র মত বলেছিল, কণা খুব ভাল মেয়ে। তাই জিজ্ঞেস করি—কণা, তুমি আমার মা হবে?···যেন এই শেষ কথা কণার সঙ্গে। এবার মাকেও কিছু বলতে হয়। ···মা, আমি চলি। আমি বলছি না এইজন্যে যে, আমি বললেও তো তুমি বলবে না, এসো।···অমল তার অবস্থান থেকে লাফ দেওয়ার মত শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে ভেবে নেয় বাসার পরিস্থিতি।···মা এখন ফ্রীজ খুলে বীয়রের বোতল বের করছে সঞ্জয় কাকুর জন্যে, ওর যে কী ভীষণ তেষ্টা জানতে পারছে না। এরপর যখন কোন না কোনভাবে ওতে পৌঁছে দেওয়া হবে বাসায় তখন মা কী বুঝতে পারবে, অমলের তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল।

অমল কীরকম হয়ে যায়। হঠাৎই। দুচোখে অপার বিস্ময়, দুঠোঁটে অমল হাসি। আর লাফ দিতেও ভুলে যায়। দেখছে। মাঠের ভেতর দিয়েই যে পথ, অমলকে ও তাদের বাবা গোরনিদ্রা যায়, এখানে পৌঁছে দিয়েছে, সেই পথই আবার পথ দেখায়। অমল দেখতে পায়।

এক আশ্চর্য দৃশ্য। ধূসর পথের ওপরই মাহয়াঙা ডুবছে ভাসছে, কখনও দেখা যায় কখনও দেখা যায় না, এভাবেই এগিয়ে আসছে। নির্ভুল। এবং এসেও যায়। তখন অমলের সবই মনে পড়ে। আজ সকালে শিশিরের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার পর কণার সঙ্গে গল্প করার সময় কণা খুব ঠোঁট ছড়িয়ে

হেসেছিল—মাছরাঙা, মাছরাঙা। আর হাসলে কণার গালে টোল পড়ে। সকালের সেই মাছরাঙা। মাছরাঙা পাখি নয়, আসলে মানুষ। লোকটা রঙীন পোশাক পরে জনপদের রাস্তায় মুখে চোঙা লাগিয়ে কোল্ডড্রিঙ্কের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে বলেছিল—খুশখবর, খুশখবর। এই ওর জীবিকা। আর অমলের সবই মনে পড়ে। লোকটা ওর চোখে চোখ পড়লে, আও রাজা করো মজা আর কণার চোখে চোখ পড়লে, আও রানী পিও পানি বলেছিল। ওরা কোরাসে হেসেছিল।

এখন অমল সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে, নীচে খুশখবর-অলা। সেই যেমন অমলের চোখে চোখ রেখেছিল, তেমনি অথচ কোন মজাদার কথা বলে না। অমলের অস্বস্তি হয়। যদিচ লোকটার নিদাঘক্লান্ত দৃষ্টিতে কোন প্রশ্ন ছিল না, তবু ওর মনে হয়ে, খুশখবর-অলা অবাক জানতে চাইছে এই দুপুরে ও এখানে কেন? অমল অবিরল ভাবতে থাকে, কী-এর জবাব? বলা যায় কী, আমি তেষ্টা মেটাতে এই মকবরায় এসেছি? বললে খুশ-খবর-অলা আরও অবাক হবে। যখন অমল এইরকম ভাবছে লোকটা ছিমছাম বলল—আয়ে! এ তো রাজা। কী যে ভাল লাগে অমলের। ও নেমে আসে।

খুশখবর-অলা ঝোলা নামিয়ে বসেছে। রোজই বসে। ঘরে ফেরার পথে এই ওর বিশ্রামস্থান। বিশ্রাম করে আর কচমচ কাঁচা পেঁয়াজ চিবিয়ে খায়। এই দৃশ্য দেখে অমল মুখ টিপে হাসল। খুশখবর-অলা প্রবাসিদ্ধ একবার হ্রস্ব একবার দীর্ঘস্বরে বলতে থাকে—পিয়াজ খাও, পিয়াস হঠাও। অমল ঠোঁট ছড়ায়।

এরপর খুশখবর-অলার সঙ্গে অমলের ভাব হয়ে যায়। আর ওর ভালবেসে দেওয়া খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ অমল একটু একটু চিবোতে থাকে মাঠের দিকে চেয়ে।

মাঠময় ছড়ানো ছিটানো পাথর। কাছে দূরে। তারি মধ্যে মকবরা, কোনটার ছাত নেই, শুধু দেয়াল—লালরঙের, হলুদ রঙের, ছাই রঙের পাথরের। আর এক জোড়া গোল গম্বুজ। এই সব দেখতে দেখতে অমলের চোখে পড়ে গম্বুজের কাছেই একটা গভীর ব্যাপার। সেটা কী অনুমান করতে চেষ্টা করে পারে না। ঘুম থেকে উঠার মত হাই তুলল—ওটা কী? ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে খুশখবর-অলা রাজহাঁসের মত গলা বাড়ায়—

পানিমহল। অমল জিজ্ঞেস করে—ওখানে জল আছে? সে বলল—অঢেল।

পানিমহল মাটির নীচে। মহলে নামবার সিঁড়ির মুখে অমলকে দাঁড় করিয়ে খুশখবর-অলা বোঝাতে থাকে—ওই তালাও, ওই হামাম, ওই রঙ-মহল। অমল আশ্চর্য হয়—সবই গভীরে। ও ধীরে ধীরে নামতে থাকে। একতলা, দোতলা, তিনতলা। ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা। খুশখবর-অলা বিজ্ঞের মত বোঝাতে থাকে, মেজাজ খুশ করার এ এক সুন্দর ব্যবস্থা। জল-চলচল। শীতল। সে যত কথা বলে তত অমলের তেষ্টা বাড়ে। বলল—আমি আর পারছিনে।

পানিমহলের ঠাণ্ডা জল আকণ্ঠ পান করার সময় অমলের কেবলই কণাকে মনে পড়ে। এমন একটা আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। কণা থাকলে বেশ হত। একদিন কণাকে নিয়ে আসবে।

নতুন বই

তেরশ তিরাশীর পয়লা বৈশাখে প্রকাশিত দুখানা বই সমালোচনার জন্য আমাদের হাতে এসেছে। প্রথমটি প্রভাস ভদ্রের গল্প সংকলন 'বরং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী' এবং দ্বিতীয়টি জ্যোৎস্নাময় বসুর 'সিকিদিদি।'

(১)

প্রভাস ভদ্রের গল্প সংকলনে রয়েছে দুইটি গল্প। প্রভাস ইদানীং সাময়িকীতে কিছু কিছু গল্প লিখছেন। আনন্দবাজার, অমৃতে প্রকাশিত কিছু গল্পের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। কৃত্তিবাসেও বেরিয়েছে গল্প। সে হিসেবে তাকে একেবারে অপরিচিত লেখক হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভবত সত্যকে অস্বীকার করা। বরং ছোট গল্পের পাঠক মহলে কথঞ্চিৎ পরিচিতি তার আছে। এই গল্প-সংকলন তার সেই পরিচিতির ব্যাপ্তি ঘটাবে বলেই আমাদের নিশ্চিন্ত বিশ্বাস।

তার স্বলিখিত ভূমিকা থেকে জানা গেল, ইদানীং প্রকাশিত দু'টি গল্পের সংকলন এটি। মাত্র দু'টি গল্প থেকে একজন লেখকের লিখনশৈলী, কাহিনী নির্বাচন, জীবনবোধ ইত্যাকার যাবতীয় জটিলতার আবরণ উন্মোচন করার প্রচেষ্টা, সম্ভবত, সবসময় ফলবতী হয় না। তথাপি এই ক্ষুদ্রকায় সংকলনটিকে ভর করেই আমাদের আলোচনার সূত্রপাত অথবা সমাপ্তি রেখা টানতে হবে।

গল্প কেমন লেখা হবে? অথবা কী নিয়ে গল্প লেখা হবে? কাহিনী থাকবে, কী থাকবে না। কৃষক-শ্রমিকদের নিয়ে লেখা হবে কিংবা মধ্যবিত্তদের নিয়ে লেখা হবে অথবা নিজেকে, শুধু নিজেকে নিয়েই হবে গল্পের অবতারনা? এই নিয়ে বাদ-বিতর্কের অন্ত নেই, অনেক কাল। অনেকে বলেছেন গল্প থেকে এবার গল্পকেই দাও ছুটি।

তাছাড়া আছে অস্তিবাদী দর্শনের দাপট, এলিয়েনেশন কিংবা জেনারেশন গ্যাপের প্রবক্তাদের মহিমান্বিত প্রভাব। আমাদের সৌভাগ্য, প্রভাস তেমন কোন আদর্শের অনুসারী হননি।

প্রভাস প্রধানত শিল্পী, প্রথা প্রকরণে তাই অহেতুক ভাঙচুরে তার প্রবল অনীহা। অত্যন্ত সঠিক তার বাক্য-শব্দ বিন্যাস। যা, আজকের অনেক তরুণ লেখকেরই অনুকরণীয় বলে আমার বিশ্বাস।

গল্প কয়টির বিষয়বস্তু মুখ্যত খুব সমস্যামূলক। সে সমস্যা অর্থনৈতিক, কখনও প্রেম প্রীতি বিষয়ক, কখনও পূর্ণত আত্মিক। দৈনন্দিন জীবনের নানান সমস্যা তাই স্বভাবতই জুড়ে বসেছে গল্পের মধ্যে। সৃষ্টিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক সকলেরই কিছু বলার থাকে। এক কথায় বলা যায়, নিজের কিছু অন্যকে জানান দেওয়ার আকাংখাতেই তাবৎ সৃষ্টির সৃজন। যাঁরা এটা অস্বীকার করেন, তারা হয়ত ভণ্ডামী করেন নচেৎ পাগলামী। প্রভাস বাবুও তাই মুখ্য লেখক হিসেবে কিছু বলতে চেয়েছেন, কখনও সমাধানের ইঙ্গিতও করেছেন। সবিনয়ে বলব, সে সব 'মুস্কিল আসান' মূলক সমাধানে আলোচকের হৃদয়ের সায় নেই অনেক ক্ষেত্রে। তবুও আমার এই দুর্ভাগা দেশে যখন আমরা হতাশার অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি নিরন্তর, তখন প্রভাসবাবু তার সৃষ্ট গল্পে যে নতুন আশাবাদের সুর শুনিয়েছেন তাকে উপেক্ষা করি কোন স্পর্দ্ধায়। অনেকটা হালকা ধাঁচে তিনি জটিল বিষয় সমূহের যে ভাবে উপস্থাপনা করেছেন তা সৎ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে বলে ভরসা করি।

দারুণ ঝকঝকে ছাপা। তিতাস ভট্টাচার্য আঁকা প্রচ্ছদটিও মনোরম।

(২)

'সিকিদিরি' জ্যোৎস্নাময় বসুর প্রথম উপন্যাস। এর আগে তিনি একখানা নাটক লিখেছিলেন এবং তাছাড়া কিছু কিছু গল্প। উপন্যাসটির পটভূমি একটি বিশেষ অঞ্চলভিত্তিক। বাংলা সাহিত্যে এমনি অঞ্চল ভিত্তিক কিংবা প্রকল্প ভিত্তিক উপন্যাসের অভাব নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চতপা, প্রশুর ঝাকর কিংবা শুণময় মান্নার জুনাপুর ফীল এর কথা। আরও এমনি অনেক উপন্যাসের নামও করা যেতে পারে।

বাঙ্গালী ভ্রমণবিলাসীদের অনেকের সঙ্গেই চাক্ষুস মিলন ঘটেছে রাঁচীর অদূরে নয়ন মুগ্ধকর হুড্রু জলপ্রপাতের সঙ্গে। সেই জলস্রোত আজ জল বিদ্যুৎ উৎপাদন হিসেবে ব্যবহৃত হতে চলেছে। স্বভাবতই জনবিরল

এবং প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত এই অঞ্চলটি হঠাৎ কর্মমুখর হয়ে উঠেছে, গড়ে উঠছে একটি শিল্প নগরী, এসেছেন ভারতের নানা অঞ্চলের অধিবাসীরা। এসেছেন সহায় সাহেব, সেন সাহেব, গুহ সাহেব, চৌধুরী বাবু, দত্ত বাবু, গুপ্তবাবু। এ ছাড়া রয়েছেন মেম সাহেবরা, গিন্নিরা। শ্রমিক নেতা শিউনারায়ণ। আদিবাসীরা। এ সমস্ত মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন জনবসতি। এবং এরাই জ্যোৎস্নাময় বাবুর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র। তিনি আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন এই সব মানুষের হাসি কান্না দুঃখ বেদনার কথা। আমাদের কাছে সবচেয়ে ভালো লাগবে দেবতোষ ও জয়ন্তীর চরিত্র কল্পনা। দেবতোষের সিকিদিরি ছাড়ার অংশটি পাঠকদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করবে। এ ছাড়া ঔপন্যাসিক গভীর মমতায় উপস্থাপিত করেছেন বঞ্চিত আদিবাসীদের দুঃখ বেদনা। আদিবাসীদের গানটা ভালো লাগবে।

প্রখ্যাত শিল্পী বিপুল গুহ অংকিত প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়। ছাপাও প্রশংসনীয়। আমরা এমন একটা উপন্যাসের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্যামল সেন

WITH BEST COMPLIMENTS OF

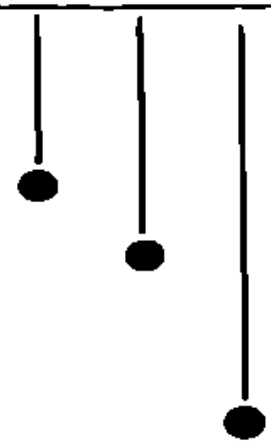

S. Mitra

CONTRACTOR

7B, Deshapriya Park Road,

CALCUTTA-26.

With best compliments

T. K. STEEL FABS.

DESIGNERS, FABRICATORS, ERECTORS

10/1, MALL ROAD,
CALCUTTA-700028

শ্রীরঞ্জিন দত্ত কর্তৃক জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স, ৫১/১, পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত ও ৩০/১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত।